সাধু জীবন—

হেরম্বচন্দ্র।

শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকাসহ

সাধুজীবন

হেরম্বচন্দ্র।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়

প্রণীত।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রসমিতি হইতে

শ্রীরাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বরিশাল—ন্যাশনাল মেসিন প্রেসে

শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২১।

মূল্য ৵০ তিন আনা।

ভূমিকা।

হেরম্বচন্দ্রের জীবনের ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথমেই মনে হইতেছে—"কালের কি গতি! আজ কোথায় হেরম্ব আমার জীবনী লিখিবেন, না, আমি তাঁহার জীবনীর ভূমিকা লিখিতে বসিয়াছি!" একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তিনি যত অল্পসময়ে দিব্যধামের অধিকারী হইয়াছেন, আমার বোধ হয়, সেই অধিকার লাভ করিতে অনেক দিন বাকী। প্রকৃতই হেরম্বের জীবন ও মৃত্যু আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনি যেন দিব্যধামের যাত্রিগণের কি কি সম্বল লইয়া চলিতে হইবে, বহুল পরিমাণে তাহাই দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এই যুবকের জীবনে কোনও ক্ষুদ্র ত্রুটী ছিল না বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহার বিনয়-মণ্ডিত নিঃসঙ্কোচ তেজ, সরল সান্দ্রাভক্তি, প্রাণঢালা নরসেবা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মপর্যাবেক্ষণ আমাদিগের সকলেরই অনুকরণীয়। যে তেজ, কার্‌লাইলের ন্যায়, অপরের সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ, যে তেজ ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারে—"আমি অপবিত্র? পাপ করিয়াছি? প্রায়শ্চিত্ত কি? জ্বলন্ত আগুণ? আচ্ছা, তুমি আগুণের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাক, আমি ঝাঁপ দিব। উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্র? ডাক, ডুবিব।" যে ভক্তি শারদীয়া জ্যোৎস্না সম্ভোগে উচ্ছ্বসিত হইয়া গাহিল—

"হাসি হাসি কেবল হাসি
যে মুখ থেকে আস্‌চে ভাসি
তাঁরই তরে প্রাণ উদাসী
বা'র হয়েছি দেখ্‌ব ব'লে।"

যে ভক্তি ভগবানকে প্রাণারাম নামে অভিহিত করিয়া বলিল—"তুমি আমায় এমন করিয়া ফেলিয়াছ যে, তোমায় ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না।" যে নরসেবা অক্লান্তভাবে স্মিতমুখে কত ভীষণ কলেরা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শুশ্রূষা করিয়া, মলমূত্র দূর করিয়াও অতৃপ্তপ্রাণে বলিয়াছে—"প্রাণ খুলিয়া ত রোগীদের কখনও সেবা করি নাই।" যে আত্মপর্য্যবেক্ষণ চাঁদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিতেছে—চাঁদ কি আমার ভালবাসার পাত্রের জিনিষটিই এই বলিয়া মধুর? না, যদি তাহা হইত, তবে চাঁদ দেখিলে প্রাণের দুয়ার খুলিয়া যাইত, চাঁদ দুয়ার খুলিয়াই বিদায় হইত, আর আমি সেই সুন্দর 'বরেণ্যং'টীকে দেখিতে দেখিতে মজিয়া যাইতাম।" সে তেজ, সে ভক্তি, সে নরসেবা, সে আত্মপর্য্যবেক্ষণ কোথায় পাই? আর যে আত্মানুভূতি ভূমানন্দের কণিকা লাভ করিবামাত্র বলিয়া উঠিল—"তারাগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কোন কোন মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল যে, আমি যেন পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশে যাইয়া এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছি যে, এক সময়ে অনেকগুলি নক্ষত্রে থাকিতে পারি। ঐ বিশালত্বের সহিত তুলনা করিয়া আমি আমার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না।" এইরূপ আত্মানুভূতি জগতে দুর্লভ।

হেরম্বের এই উক্তি পড়িয়া কীটস্‌কে মনে পড়িল—

"I feel more and more everyday, as my imagination strengthens, that I do not live in this world alone, but in a thousand worlds." 'দিনে দিনে যতই আমার অধ্যাত্মদৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে ততই বুঝিতেছি, আমি কেবল এই পৃথিবীর অধিবাসী নহি, পরন্তু সহস্র সহস্র জগতে বাস করিতেছি।'

হেরম্ব—তাঁহার মর্ত্ত্যালোকস্থ অল্পজীবনপরিসরমধ্যেই "যো বৈ ভূমা

তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি” উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত হইতে ছিলেন। ইহাদ্বারা তাঁহার এমন একটী আকর্ষণীশক্তি জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পরিচিত বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার কথা, গান, আচার ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। অনেক বালক ও যুবকের চরিত্রে তাঁহার 'সঙ্গগুণে রং' ধরিয়াছে। তিনি যে মণ্ডলীমধ্যে বাস করিতেন তাহা যেন দিব্যসৌরভে পূর্ণ করিয়া লইতেন। তাঁহার জীবনে যেরূপ, মৃত্যুতেও তেমনি ভাগবত ভাব উদ্ভাসিত হইয়াছিল। যাহা জীবনে অভ্যস্ত হয় তাহাই মৃত্যুকালে প্রকাশ পায়। জীবনব্যাপী ভক্তিচর্চ্চার ফলে মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও হেরম্বচন্দ্র হরিনামরসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাকে ভগবানের নাম শুনাইতে অনুরোধ করিয়াছেলেন। পরে নিজেই বারংবার 'দুর্গানাম' ও 'ওঁ তৎ সৎ' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্তিমকালে তাঁহার প্রাণপাখী "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" গাহিতে গাহিতে ত্রিদিবাভিমুখে উড্ডীন হইল। এমন মৃত্যু ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? হেরম্বের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই ধন্য। হেরম্বচরিত্রের ছায়ায় বঙ্গীয় বালক ও যুবকগণের চরিত্র গঠিত হইলে "বন্দেমাতরং" ধ্বনি সাফল্য লাভ করিবে, বাঙ্গালী জাতি জগতে গৌরবান্বিত হইবে, ভগবান্ এজাতির মস্তকে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

বরিশাল,
২১শে কার্ত্তিক। } শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

সূচনা।

সাধু-জনের চরণ-পদবী অনুসরণ মানব-জাতির শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সুন্দর পন্থা। সাধু সঙ্গের ন্যায় সাধু-চিন্তাও মানব মন উন্নত করিয়া তোলে। তেজস্বী জনের জীবন-কাহিনী আলোচনা করিতে করিতে হীনচরিত্র দুর্ব্বলচেতাজনেরও নৈতিকমেরুদণ্ড দৃঢ় হইয়া উঠে। দৃঢ়-নৈতিকমেরুদণ্ড-সম্পন্ন ব্যক্তি শারীরিক দুর্ব্বল হইলেও আপনার ভিতরে অযুত হস্তীর বল অনুভব করেন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তিনি ন্যায়ের সংগ্রামে অগণ্য বিপক্ষকেও ভয় করেন না। সাধুগণ ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্য প্রভৃতির গৌরব রক্ষার জন্য সমসাময়িক অজ্ঞ কিম্বা অধার্ম্মিক ব্যক্তিবর্গের নিকট অশেষ পীড়ন সহ্য করিয়া, কুত্রাপি পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া পৃথিবীতে ভগবৎ মহিমা বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মহাপুরুষগণ আবহমান কাল মানবজাতির শিক্ষার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের শুভ্রোজ্জ্বল যশোরাশি দেশকালের প্রাচীর ভেদ করিয়া দেশে বিদেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধে যে তেজস্বী যুবকের হ্রস্ব জীবিত কালের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইবে তিনি এতাদৃশ দেশবিশ্রুত মহাপুরুষ নহেন। তিনি অরণ্যের একদেশে অর্দ্ধস্ফুট সুগন্ধ পুষ্পবৎ নীরবে স্বীয় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তেজস্বিতা, বিনয়, ভগবৎ প্রেম ও কর্ম্মতৎপরতা প্রভৃতি দুর্লভ গুণরাজির একত্র সমবায়ে যুবকের জীবন পরম রমণীয় হইয়া উঠিতেছিল। এই কর্ম্মবীর চরিত্রবান্ যুবকের ইতিবৃত্ত নিরাশহৃদয় কর্ম্ম-কুণ্ঠ যুবক ও বালকমণ্ডলীর হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে পারে এমত ধারণা অযৌক্তিক নহে। সাধারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াও যুবকগণ

কিরূপে কাজের মানুষ হইতে পারেন, যুবকের জীবনকাহিনী ইহাই প্রদর্শন করিবে। অমিত শক্তি লইয়া যে সকল মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসারে অলৌকিক ব্যাপার সাধন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের শক্তিও কার্য্যাবলীর প্রকৃতি আমরা সকল সময়ে ধারণা করিতে পারিনা। এই শ্রেণীর সাধুদিগকে আমরা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আখ্যা প্রদান করি এবং অলোকসাধারণ চরিত্র বলিয়া আমাদিগহইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের উচ্চশ্রেণীর মানব মনে করি।

এই প্রবন্ধে যে যুবকের জীবন-চরিত সংক্ষেপে আলোচিত হইবে তাঁহার চরিত্র ও কার্য্য সমূহ তাদৃশ অলৌকিক নহে; ইঁহার জীবন সাধারণের জীবনের ন্যায় ভালমন্দে মিশ্রিত; তথাপি ইনি সাধু ইচ্ছার প্রণোদনায় স্পৃহণীয় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাই এই ধর্ম্মপ্রাণ যুবকের চরিত্র আমাদিগকে আশা প্রদান করিবে।

দীর্ঘায়তন, গম্ভীরপ্রকৃতি, সৌম্যমূর্ত্তি হেরম্বচন্দ্রকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। প্রবন্ধ লেখক সাধু যুবকের পূতচরিত্র যথাযথ আঁকিয়া তুলিতে পারিয়াছে বলিয়া স্পর্দ্ধা করে না। যাঁহারা এই যুবককে কখনও দেখেন নাই তাঁহাদের অবগতির জন্য এ জীবনচরিত সাধারণে প্রচারিত হইতে চলিল। প্রবন্ধ পাঠে কাহারও বিন্দুমাত্র উপকার হইলে লেখকের শ্রম সফল হইবে।

হেরম্বচন্দ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরিচয় ও বাল্যকাল।

ঢাকা জিলার অধীন সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত থালিয়াবরগা নামক গ্রামে হেরম্বচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। সর্ব্বগ্রাসী পদ্মার ভীষণ আক্রমণে তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমির চিহ্নমাত্রও আজি বর্ত্তমান নাই। যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন উহা নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে একটী সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত পরিবার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

হেরম্বচন্দ্রের খুল্লপিতামহ ৺ বঙ্গচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুলিস সব্ ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য করিতেন। তদবধি ইঁহাদের বাড়ী "দারোগাবাড়ী" বলিয়া অভিহিত হইত।

তদীয় পিতৃদেব ৺ প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাধুপ্রকৃতি ও পরোপকারী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণ ইঁহাকে আর্ত্তের সহায় ও বিপন্নের বন্ধু বলিয়া জানিতেন। প্রতিবেশী-দের বিপদের দিনে তিনি স্বীয় শক্তিমত তাহাদের উপকারার্থে যত্নশীল হইতেন।

তাঁহার চরিত্রের একটি উত্তম উপাদান ছিল আত্মাবলম্বন; তিনি আপনার প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। কোন প্রকারে সাহায্য-প্রার্থী হইয়া কাহারও দ্বারস্থ হইতে লজ্জিত হইতেন। সংসারের সমুদায় কাজই তিনি অতি সুনিপুণভাবে ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে জানিতেন। হেরম্বচন্দ্র পিতার নিকট হইতে উল্লিখিত সদ্‌গুণগুলি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে, একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, পিতৃদেব শৈশবে তাঁহাকে বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করাইতেন এবং তন্মধ্যে এই শ্লোকটি পড়াইতেন :—

"বরমসিধারা তরুতলবাসঃ,
বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে মরণং,
নচ ধন গর্ব্বিত বান্ধব শরণং॥

এইরূপে বুদ্ধিমান্ পিতা শিশুর সরস হৃদয়ক্ষেত্রে শৈশবে আত্ম নির্ভর ও অপর বিবিধ সদ্‌গুণের বীজ বপন করিয়াছিলেন এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই বীজ সমূহ পল্লবিত সুচ্ছায়বৃক্ষে পরিণত হইয়া যুবকের হৃদয়ক্ষেত্র একখানি পরম রমণীয় উদ্যান করিয়া তুলিয়াছিল। যুবক হেরম্বচন্দ্র তাঁহার সম্পর্কিত আত্মীয় হউন বা পরিচিত বন্ধু হউন, প্রার্থীরূপে কাহারও দ্বারস্থ হইতেন না। তিনিও পিতার ন্যায় আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিতেন। হেরম্বচন্দ্রের পিতার দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নীর গর্ভে চারিটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বরিশাল সহরে কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। হেরম্বচন্দ্র তাঁহার মাতার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তান; তাঁহার

কনিষ্ঠ ভ্রাতা অকালে ৭ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। হেরম্বচন্দ্র ১২৮৪ সনের ১২ই মাঘ খালিয়াবরগাঁয় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পরে ও পৈত্রিক বাসভবন পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ায় হেরম্বচন্দ্রের পরিবারবর্গ খালিয়াবরগাঁ ছাড়িয়া তাঁহার মাতুলালয়ে ব্রাহ্মণগাঁয়ের নিকটবর্ত্তী পাইকারা নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে হেরম্বচন্দ্র মাতৃদেবীর আগ্রহাতিশয়ে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট্‌স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। শিশু হেরম্বচন্দ্র বাল্যকালে সর্ব্বদা বৈমাত্রেয় অগ্রজ আশু বাবুর সহিত অবস্থান করিতেন। শিশু মায়ের সঙ্গ অপেক্ষা আশু বাবুর সঙ্গে অধিক সময় কাটাইত। রাত্রিকালে আশু বাবুর ক্রোড়েই সুখে নিদ্রা যাইত, অন্যত্র শয়ন করিলে তাঁহার নিদ্রা হইত না। উভয়ের মধ্যে কি যেন দুশ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধন ছিল বলিতে পারি না। পরস্পর পরস্পরের অদর্শনে বড়ই ব্যাকুল হইতেন।

আশু বাবু নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। ইনি বিহার অঞ্চলের জনৈক মহাপুরুষের শিষ্য। ইনি সাধুজনোচিত পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন। এই ধার্ম্মিক ভ্রাতার সহবাসে সুকুমার বয়সেই হেরম্বচন্দ্রের ধর্ম্মানুরাগ প্রস্ফুটিত হইতেছিল। শৈশবকালেই তিনি পবিত্রতা ও সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন।

বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সহোদর হইতেও অধিক স্নেহ করিতেন। ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ীতে আরম্ভ হইয়াছিল, বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার ইংরেজী অক্ষর

পরিচয় হইয়াছিল। অতঃপর বিদ্যার্থী বালক লৌহজঙ্গ উচ্চ স্কুলে প্রেরিত হইল। প্রথম শিক্ষার সময় গণিতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না থাকায় তথায় অঙ্কের ঘণ্টায় তাঁহাকে ভীত থাকিতে হইত। শুনিয়াছি অঙ্কের পড়া প্রস্তুত করিতে না পারিলে জনৈক শিক্ষক তাঁহাকে মাঝে মাঝে ঝাউয়ের ডাল দিয়া প্রহার করিতেন।

এই সময় বালক হেরম্বচন্দ্রকে মাঝে মাঝে যাজনিক কার্য্য করিতে হইত। বাল্যের সেই দুঃখ-স্মৃতি মনে করিয়া যুবক আমাদের কাছে মাঝে মাঝে পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণের দুর্গতির কথা প্রকাশ করিতেন। এই বাল্যকালেই তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শিশু হেরম্বচন্দ্র গোচারণ পরম প্রীতিপ্রদ মনে করিতেন। তাই অবসর দিনে নিকটবর্ত্তী মাঠের ভিতর গরু ছাড়িয়া দিয়া নিজে পল্লবিত সুচ্ছায় বৃক্ষতলে বসিয়া পবনান্দোলিত শ্যামল শস্যক্ষেত্রের নেত্র-তৃপ্তিকর শোভা দর্শন করিতেন; কখনও বা মনের আনন্দে গান গাহিতেন। এইরূপে বাহ্যপ্রকৃতি কোমলহৃদয় বালকের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঁকীপুর ও কৈশোর জীবন।

হেরম্বচন্দ্রের অগ্রজ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাঁকীপুর কোন আফিসে কার্য্য করিতেন। বিদ্যার্থী হেরম্বচন্দ্র লোহজঙ্গ ছাড়িয়া ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে তথাকার Ghosh's Academyতে ভর্ত্তি হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম,এ, বি, এল মহোদয়ের স্থাপিত আঙ্গলোসংস্কৃত বিদ্যালয়ে গমন করেন। চরিত্র মাধুর্য্যগুণে তিনি অত্যল্প দিন মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। বিনয়ী, বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র হেরম্বচন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও স্বত্বাধিকারী পূর্ণেন্দু বাবুর বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। পূর্ণেন্দু বাবু হেরম্বকে প্রত্যহ ২।১ ঘণ্টা পড়াইতেন। হেরম্বচন্দ্রের আগ্রহাতিশয়ে তিনি হৃষ্টচিত্তে স্বীয় বিদ্যালয়ে গীতা পড়াইবার জন্য একটি ক্লাস খুলিয়াছিলেন। বাঁকী-পুরের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুত হারাণচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি এবং পূর্ণেন্দু বাবু "থিয়সফিক্যাল" সোসাইটীর মেম্বর ছিলেন। ইঁহাদের সহিত হেরম্বচন্দ্র Anne Besant এবং Colonel Olcott এর নিকট যাইতেন। ক্রমে ক্রমে ধার্ম্মিক হেরম্বচন্দ্রের চরিত্রগুণে তাঁহারাও তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন।

হেরম্বচন্দ্র বাঁকীপুরের যোগী সোমনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট গীতা, পাতঞ্জল ও অষ্টাবক্র সংহিতা অধ্যয়ন করেন। অগ্রজ আশু বাবুর নিকট

পঞ্চদশী পড়িয়াছিলেন। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আশু বাবু বায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহাকে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন। গুরুর বিনা আদেশে হেরম্ব-চন্দ্র প্রণায়াম করিতে চেষ্টা করিতেন। আশু বাবু বলেন যে, এ কারণে তিনি হ্রস্বায়ু হইয়াছেন।

বাৎসারিক পরীক্ষায় হেরম্বচন্দ্র প্রায় সকল ক্লাসেই সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতেন। ইঁহার প্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত নেত্র ও দীর্ঘ কলেবর দর্শনে কোন কোন সাধু পুরুষ ইহার ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল বলিয়া প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে একটি বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। একদা স্কুলের ঘণ্টা বাজিবার পূর্ব্বে হেরম্বচন্দ্র সহধ্যায়ী ছাত্রবর্গের সহিত ব্রাহ্মগণ কিরূপভাবে ও স্বরে উপাসনা করেন তাহার অনুকরণ করিতেছিলেন। বন্ধুবর্গের অনুরোধে তিনি নিমীলিতনেত্রে উপাসনা করিতেছিলেন। চারিদিক হইতে অপর ছাত্রগণ হাসিতে লাগিল; উপাসনা চলিতে লাগিল। ভগবানের নাম লইতে লইতে অল্পকালের মধ্যে উপহাস ও কৌতুকস্পৃহা টুটিয়া গেল। সত্য সত্যই প্রাণে আঘাত পাইতে লাগি-লেন। আপনার ভিতরের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লাস ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। এই ঘটনার পর হইতে হেরম্বচন্দ্র কখনও কোন সম্প্রদায় বিশেষের নিন্দা করেন নাই। কৈশোরেই তিনি এবম্বিধ ধর্ম্ম প্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি রীতিমত ধর্ম্ম সভায় যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। হেরম্বচন্দ্র আশৈশব কীর্ত্তনানুরাগী ছিলেন। ভগবানের নাম লইতে লইতে আত্মহারা হইতেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইতেন। ধর্ম্মপ্রাণ শিশুর মুখে মধুর ভগবান্ নাম শুনিয়া তত্রত্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ ঘোষ মহাশয় নিরতিশয় মুগ্ধ হইতেন। তিনি মাঝে মাঝে হেরম্বচন্দ্রকে আপন ভবনে

আনাইয়া তাঁহার মুখে ভগবানের নাম শুনিতেন। আঙ্গলো সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতে হেরম্বচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বাঁকীপুর ত্যাগ করেন। চরিত্রগুণে বাঁকীপুরের অনেক ভদ্রলোকেই তাঁহাকে সহোদরতুল্য স্নেহ করিতেন। তথাকার জনৈক অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হেরম্বচন্দ্রের অবস্থা নিঃস্ব জানিয়া নিজ ব্যয়ে তাঁহাকে পাটনা কলেজে পড়াইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তেজস্বী হেরম্বচন্দ্র আপনার দুর্গতির কথা জানিয়াও বন্ধুর এই অযাচিত অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কত বালক আপন আপন প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া স্কুল ও কলেজে বিনা বেতনে পড়িয়া থাকেন! তাহারা এই যুবকের দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া আত্মসম্মান শিক্ষা করিবেন। হেরম্বচন্দ্র অর্থাভাব ও দরিদ্রতার ক্লেশ অম্লান বদনে সহ্য করিতেন তবু ও প্রার্থীরূপে ধন দৃপ্ত বন্ধু স্বজনের নিকট উপস্থিত হইতেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গুরুভক্তি, সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও পাপের সহিত সংগ্রাম।

ইতিপূর্ব্বে হেরম্বচন্দ্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বরিশাল সহরে কলেরা-রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, এই জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যখন বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পড়িবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন, তখন তাঁহার জননী অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহাহউক

যুবকের ঔৎসুক্য ও আগ্রহাতিশয়ে মাতা ও অভিভাবকগণ তাঁহাকে বরিশালে প্রেরণ করেন।

বরিশাল আসিয়া হেরম্বচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত একজন পুলিস কর্ম্মচারীর সহিত কয়েকদিন অবস্থান করেন। পরে তথা হইতে সায়েস্তাবাদের প্রসিদ্ধ মীর সাহেবদের বাসাস্থিত একটী ছাত্রাবাসে আসিয়া বাস করেন। এখান হইতেই তিনি আস্তে আস্তে ছাত্র মহলে পরিচিত হইতে আরম্ভ হন। তাঁহার সাধুজনোচিত মূর্ত্তি ও আন্তরিক ভাগবত সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া বরিশাল বাল্যাশ্রমের আচার্য্য, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহাকে বাল্যাশ্রমের আশ্রমী করেন। তদানীন্তন আশ্রমীদের মধ্যে তিনি শ্রদ্ধাবান্, বিনীত ও চরিত্রবান্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সরল প্রাণস্পর্শী ভগবৎ সঙ্গীতে বহুলোক মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং অচিরে হেরম্বচন্দ্র সর্ব্বজন প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

গুরুভক্তি হেরম্ব-চরিত্রের একটী প্রধান উপাদান। গুরুজনদের মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী তিনি পিপাসিতের ন্যায় শ্রবণ করিতেন; নিজের সুখ-দুঃখের কথা, চরিত্রগত সবলতা ও দুর্ব্বলতার কথা সরল বালকটীর ন্যায় তাঁহাদিগকে জানাইতেন। তাঁহার দৈনন্দিন লিপি পাঠ করিলে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইহার যাথার্থ্যের উপলব্ধি হইতে পারে। গুরুজনদের মুখে যখন যে ভাল কথাটি শুনিতেন, দৈনন্দিন লিপিতে তাহা যথাযথ লিখিয়া রাখিতেন। নিম্নে একদিনের বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

* * *

একদল লোক আছে তাহারা হাত পা ছাড়িয়া দিয়া চাতক যেমন মেঘের পানে চাহিয়া থাকে, তেমনি ভগবানের কৃপা-প্রার্থী হইয়া নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকে; আর একদল কৃপা-ভিখারী বটে, কিন্তু নিজেরাও খাটে।

কে ভাল ? শেষের দল, কারণ ইহারা কর্ম্মী, ভগবানের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিতেছে এবং যখন ভগবৎ কৃপার বন্যা আসিবে তখন ইহারা স্বীয় পরিশ্রমখনিত কূপে জল ধরিয়া রাখিবে ; বৎসর ভরিয়া পান করিয়া তৃপ্ত হইবে। আর উহারা বন্যার সময় পাইবে বটে, কিন্তু যাই বন্যা চলিয়া যাইবে আবার "স্ফটিকজল" "স্ফটিকজল" করিয়া চাতকের মত চীৎকার করিবে।

মা ভাই, দাদা, চাচা, ফুফু এদের দুঃখে আমার দুঃখ হইবে কেন ? অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান করিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা। এই শরীরটাকেই "আমি" মনে করিয়া এই দুঃখ পাই—বাস্তবিক আমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই , কারণ "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং।"

ভিতরে একজন আছেন, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। ভিতরে বসিয়াই যাহা অমঙ্গলজনক শরীর হইতে তাহা ঘর্ম্ম, মূত্রাদিরূপে বাহির করিয়া দিতেছেন। তিনি সর্ব্বদাই আমায় কোলে করিয়া বসিয়া আছেন—বুকে হাত দিলে টের পাই, Direct sensation হয়, তিনি আছেন। তিনি আমার Brain centre এর উপরে বসিয়া সব করিতেছেন। পা দুটি রাঙ্গা টুকটুকে, পা দুটি ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন—টিপ্ টিপ্ করিয়া নাড়িতেছেন এবং আমাদিগকে বলিতেছেন "আমি আছি।" আবার কামাদি যখন আসে তখন শিহরিয়া উঠেন, বুকে জোরে জোরে নড়িয়া উঠে, তিনি বলেন "আমায় আর কষ্ট দিস্ না।" সমস্ত শরীরে জ্বালা তুলিয়া দেন। আমারি মনের মতনটি হ'য়ে তিনি আমাতে আছেন। কি সুন্দর ! দেখা দেন না, কারণ দেখিলে আর ত কাজ কর্ম্ম করিতে পারিব না, পাগল হইয়া যাইব। * * * * হাতে নাকি একটি বাঁশীও আছে। আরও

ভাল। হে দীনবন্ধু, তুমি আর বুড়ো হ'লে না ছোটটিই রহিলে, "কোঽয়ং সমন্ মদনসুন্দর" তাঁর পায়ের আঙ্গুল দুটি চুমিয়া চুমিয়া পিপাসা শান্ত হইয়াছে. তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সৌন্দর্য্যের লালসা শান্ত হইয়াছে। স্পর্শও কি মধুর স্পর্শ! তারপর আর কি বলিব সে সুখের কথা" ইত্যাদি।

সাধুদের উপদেশ শুনিবার জন্য ও তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে হেরম্বচন্দ্রের একটা পিপাসা ছিল। মধুকরের ন্যায় তিনি যেখানে যে মধুটুকু পাইতেন, সংগ্রহ করিয়া আপনার হৃদয়-মাঝে এক অপূর্ব্ব মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। গুরুজনদের বাক্য ত শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালন করিতেনই; সমবয়স্ক কিম্বা বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধুদের বাক্যেও হেরম্বচন্দ্র আস্থাবান্ ছিলেন। তাঁহাদের মুখে যে সকল সাধুবাক্য শুনিতেন, তাহাও কখন কখন দৈনন্দিন লিপিতে রক্ষা করিতেন।

বরিশাল সহরে অবস্থানকালে তিনি অবসর সময়ে অশ্বিনী বাবু, জগদীশ বাবু, পণ্ডিত শ্রীযুত কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, সোণাঠাকুর প্রভৃতি গুরুজনদের সঙ্গে পরম আনন্দে কাল কাটাইতেন। সাধু সঙ্গ করিবার জন্য যুবকের আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল। হেরম্বচন্দ্র বরিশাল সহরে যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক ও স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল এবং অনুসন্ধিৎসু যুবক ইঁহাদের কাছে নূতন নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করিতেন। পণ্ডিত ও সাধুজনের সঙ্গ দ্বারা তিনি দিন দিন আপনার জ্ঞানের প্রসার ও চরিত্রের বল বৃদ্ধি করিতেছিলেন। বরিশাল সহরে আগত বিদেশীয় মহাত্মাদের কেহ কেহ এই চরিত্রবলসম্পন্ন সরল যুবকের সাধু ব্যবহারে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ইঁহাদের কেহ কেহ বরিশাল ত্যাগের

পরও তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতেন। এই সকল সজ্জনদের মধ্যে পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী সারদানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মানুষের পক্ষে রক্ত মাংসের পরাক্রম অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের দৃঢ়-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ সাধ্য নহে। ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে প্রত্যেক সাধুকেই পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সাধক যাই ধর্ম্ম জীবনের দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন, অমনি পশ্চাদ্দেশে পাপের মোহন বাঁশী বাজিয়া উঠিল। পাপ চিরপরিচিত বন্ধুবেশে সুখের প্রলোভন লইয়া উপস্থিত হইল। সাধক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার চিত্ত দোদুল্যমান হইল। এইটি পরীক্ষার সময়। তেজস্বী হেরম্বচন্দ্রের জীবনে এরূপ পরীক্ষা একাধিক বার উপস্থিত হইয়াছিল। বিশ্বাস ও সঙ্কল্প দ্বারা তিনি শত শত দুর্ব্বলতা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত দৈনন্দিন বিবরণী পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি বীর পুরুষের ন্যায় ভগবানের নামের হুঙ্কারে পাপ তাড়াইয়া দিতেন। তীক্ষ্ণ আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন যুবক আপনার ভিতরের দুর্ব্বলতাগুলি দেখিয়া এক স্থলে লিখিতেছেন—"তবে কি আশা নাই? নিশ্চয়ই আছে। প্রাণের সমস্ত শক্তি (যাহা আছে) দ্বারা প্রত্যহ ভগবানকে ডাকিলে এবং মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলে ক্রমে ক্রমে শক্তি নিশ্চয়ই জন্মিবে। এ রাজ্য সয়তানের নয়, ভগবানের। মনে পড়ে নাকি একদিন ডাকার মত ডাকিতে পারিলে কি প্রকারে সেই আনন্দ তিন চারি দিন পর্য্যন্ত থাকে?" কখন বা কুচিন্তা-পীড়িত হইয়া আপনার ভিতরে আপনি বলিতেন—"I am a man; Devil, go away" তাঁহার জীবনের দুইটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই বিশ্বাসী যুবক কি প্রকারে বীরের ন্যায় পাপজয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা সহজে অনুমিত হইবে।

হেরম্বচন্দ্র জনৈক সরল স্বভাব যুবকের সহিত বহুকাল একত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, উভয় উভয়কে নিরতিশয় ভালবাসিতেন। ক্রমে ক্রমে হেরম্বচন্দ্রের আসক্তি অনুচিত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যুবকের সঙ্গলালসা বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল; ক্রমে বন্ধুর অদর্শনে তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন। তেজস্বী হেরম্বচন্দ্র আপনার দুর্ব্বলতায় আপনি অধীর হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিন চিত্তচাঞ্চল্য তাঁহার অধ্যয়ন ও কর্ত্তব্য কার্য্যাদির ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। তিনি নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই মানসিক দুর্ব্বলতা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক ছুটির দিনে তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দ্বারগুলি বন্ধ করেন এবং তথায় বসিয়া ক্রমাগত রোদন ও চীৎকার করিতে থাকেন। এইরূপে অনুতাপাশ্রু যখন তাঁহার হৃদয়ের মোহ-কালিমা কিয়ৎ পরিমাণে ধুইয়া ফেলিল, চিত্ত আপনা আপনি স্থির হইয়া আসিল, তখন তিনি হাঁটু গাড়িয়া কাতরভাবে শক্তিময় পিতার কাছে হৃদয়ের বল ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর হইতে ঐ দুর্ব্বলতা আর কদাচ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।

গ্রামস্থ বাড়ীতে অবস্থানকালে এক দিন হেরম্বচন্দ্র সাংসারিক দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠেন। কিছুতেই দুর্ভাবনা দূর হইতেছে না। হঠাৎ জনৈক শিশুর সরলকণ্ঠ তাঁহার হৃদয় ভগবদভিমুখীন করিল; অমনি তিনি চকিতের ন্যায় গাইয়া উঠিলেন—

অপার দয়া তোমার প্রেমময় হরি,
যখন আমার মন, বিষয়েতে হয় মগন
শিশুর মধুর স্বরে ঢাল প্রেমবারি।

এইরূপে ভগবানের নাম গাইতে গাইতে যুবকের হৃদয়ে বলের

সঞ্চার হইল, দুর্ব্বলতা বিদায় গ্রহণ করিল। শক্তিস্বরূপ ভগবানের ভুবন-বিজয়ী নাম ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দ্বারা যুবক দিন দিন যাবতীয় দুর্ব্বলতা পদদলিত করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জীবনের আদর্শ—নরসেবা ও অধ্যয়নস্পৃহা।

হেরম্বচন্দ্রের জীবনের আদর্শ কি? এ প্রশ্ন তাঁহাকে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি কাহাকেও এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দৈনন্দিন জীবনী পাঠ করিতে করিতে দেখা গেল এক দিনের (১৩০৮ সন, ৪ঠা কার্ত্তিক) বিবরণের শিরোভাগে লেখা আছে "Have I any Ideal?" উক্ত স্থলে ইংরেজী ভাষায় যে কতকগুলি কথা লিখিত রহিয়াছে নিম্নে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল:—

এতকাল আমি চিন্তা করিতেছি, আমার জীবনের কোন লক্ষ্য আছে কিনা? অথবা আমার জীবন কি কাণ্ডারী বিহীন তরণীর ন্যায় সংসার-সমুদ্রবক্ষে প্রত্যেক তরঙ্গতাড়নে আন্দোলিত হইতেছে? সম্প্রতি আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, এতকাল আমার এ সম্বন্ধে একটা ভ্রমাত্মক ধারণা ছিল।

সত্য সত্যই আমার অতি সুন্দর ও উচ্চ একটী আদর্শ আছে। উক্ত আদর্শ আমাকে এমন একটী প্রশস্তহৃদয়ের অধিকারী হইতে বলে, যাহা মানুষের কল্পনাশক্তি ধারণা করিতে অক্ষম। এবং যে হৃদয় সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার ও বিনীতভাবে অনন্যসুলভ আনন্দ ও প্রসন্নতার সহিত আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, বিন্দুমাত্র বিচ্ছেদযন্ত্রণা অনুভব না করিয়া উহা দরিদ্রের অভাব মোচনের জন্য দান করিতে সক্ষম। আমার আদর্শ কি? ইহা বর্ণনা করিতে মাদৃশ ধূলির জীব পারে না! তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, উক্ত আদর্শের অনুসরণ করিতে হইলে প্রাণটী ভগবৎ ভাবে পরিপূর্ণ না করিলে চলিবে না। আমার উচ্চ লক্ষ্য আমাকে এমত একটী বুদ্ধীন্দ্রিয় লাভ করিতে প্রোৎসাহিত করে, যাহা জ্ঞান-রাজ্যের বিভিন্ন-বিভাগ আয়ত্ত করিয়া সত্যোদ্ঘাটন করিতে সক্ষম। যে বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে আমি জীবন্ত শিক্ষক, উৎসাহী রাজনীতিক কিম্বা স্বদেশভক্ত হইতে পারিব এবং যাহা আমাকে এরূপ বক্তা করিয়া তুলিবে যে, আমি অগ্নিপ্রদ বাক্য বলিয়া নিদ্রিত স্বদেশবাসী লোক সমূহকে জাগাইয়া তুলিতে পারিব। কিন্তু এই জ্ঞানের ভিতর অহঙ্কারের চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান থাকিবে না।

আদর্শ আমাকে এমন একটী কর্ম্মক্ষম, বলিষ্ঠ ও সুস্থদেহ লাভ করিতে উৎসাহিত করে, যে শরীর পার্থিব যাবতীয় ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতে সক্ষম এবং যে দৈহিক শক্তি নিরহঙ্কার ভাবে অত্যাচারী নিষ্ঠুর ও উৎপীড়কের হস্ত হইতে দলিত দুর্ব্বল ব্যক্তিবর্গকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে সক্ষম।

উল্লিখিত আদর্শ যিনি আমার কাছে উপস্থিত করিয়াছেন তিনি আমার "আমিত্ব" কিম্বা "আমিত্বের চালক" অথবা "আমিত্বের কার্য্যকরী

শক্তি।" ইহাকে আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু ভিতরে ইহার অস্তিত্ব মাঝে মাঝে অনুভব করিয়া থাকি। আত্মচিন্তাদ্বারা আমি ইহা অনুভব করিয়াছি।

এই ত হেরম্বচন্দ্রের আদর্শ। গভীর আত্মচিন্তা দ্বারা যুবকের অন্তশ্চক্ষু নিঃসন্দেহ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে অনন্ত শক্তি-স্বরূপ, অনন্ত জ্ঞানের আধার, প্রেমময় ভগবান্ তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিলেন। "জীব মাত্রেরই লক্ষ্য ভগবান্, কর্ম্ম-বহিত্র দ্বারা জীবন-নদী বাহিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য স্থলে পঁহুছিতে হইবে।" প্রত্যেক সাধু-জীবনের ন্যায় হেরম্বচন্দ্রের জীবনও ইহাই প্রমাণ করিতেছে।

স্বীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়া তিনি যখন শত শত পাপক্লিষ্ট নর-নারীর আশ্রয় স্থানীয় হইতে পারিতেন বলিয়া আশা করা হইত, হেরম্বচন্দ্রের জীবনের সেই উজ্জ্বল দিনগুলি উপস্থিত হইতে পারে নাই। জীবন-মধ্যাহ্নের প্রারম্ভেই তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আপনার উচ্চ লক্ষ্যানুযায়ী হেরম্বচন্দ্র কতদূর আত্মগঠন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন সংপ্রতি আমরা তাহা আলোচনা করিব।

নিরহঙ্কার ভাবে পরহিতব্রত সাধন করা তাহার জীবনের আদর্শের একাংশ বলিয়া ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আদর্শের এই অঙ্গ সাধন করিতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

হেরম্বচন্দ্র দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি শুধু আপনার সুখ-ভোগের চিন্তা করিতে এ সংসারে আসেন নাই; যথাশক্তি পরের জন্য খাঁটিতেই তিনি এ সংসারে আসিয়াছেন। এক দিনের (১৯০১, ১৬ই এপ্রিল) দৈনন্দিন বিবরণীতে তিনি লিখিয়াছেন :—

হাঁটিতে হাঁটিতে মাকে বলিলাম :— "শক্তিস্বরূপিণি, দুর্ব্বলকে শক্তি দাও। মা আমাকে পাঠাইয়াছেন জীবন পাত হইলেও যাইব ;' এ শরীর পরিবারবর্গের, বন্ধুবর্গের, স্বদেশের ও জন-সাধারণের জন্যই ক্ষয় করিব। তোমার আত্মা তোমাকে দিব। সমস্ত পথ চলিয়া আসিলাম বাস্তবিকই যেন শক্তি সঞ্চারিত হইল নচেৎ এত সকালে এতদূর আসিতে পারিতাম না।" উপরের উদ্ধৃতাংশ হইতে ইহা সহজে অনুমিত হইবে যে, হেরম্বচন্দ্রের প্রাণ প্রেম-পরিপূর্ণ ছিল, তিনি পরার্থে আত্ম-ত্যাগ করিয়াই অতুল আনন্দ লাভ করিতেন।

অন্ধ ও আতুরকে অর্থ দান, স্বহস্তে গৃহহীনের গৃহ নির্ম্মাণ, বস্ত্রহীনের বস্ত্র দান, বিপন্ন ও আশ্রয়হীন রোগিগণের সেবা ও তাঁহাদের ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা ইত্যাদি লোক-হিতকর কার্য্য যে হেরম্বচন্দ্র কত করিয়াছেন ঠিক করিয়া বলা যায় না। দয়া-প্রবণ হেরম্বচন্দ্র বিপন্ন দরিদ্রজনকে সাহায্য ও রোগিদের সেবা করিবার সময় স্বকীয় শারীরিক সামর্থ্য ও দরিদ্রতার কথা ভুলিয়া যাইতেন। ধনবান্ আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থের অংশ দরিদ্রকে দান করেন, ইহা মহত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত যখন বিগলিতহৃদয়ে আপনার মুখের গ্রাস অধিকতর ক্ষুধার্ত্তের মুখে তুলিয়া দেন, তখন অধিকতর মহত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে ইহা সুনিশ্চিত। হেরম্বচন্দ্রের এবম্বিধ দানের দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে নিরাশ্রয় রোগিদের সেবার জন্য (The Little Brothers of the Poor) "দরিদ্রদের সেবকদল" নামক একটি সম্প্রদায় আছে। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি এই সম্প্রদায়ের সম্পাদক ছিলেন। হেরম্বচন্দ্র যেমন অক্লান্তভাবে ও প্রসন্ন-

চিত্তে রোগী সেবা করিতেন অতি অল্প লোককেই তেমন ভাবে রোগী সেবা করিতে দেখা যায়। রোগী সেবা করিয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন। যাহারা কর্ত্তব্যবোধে রোগীর শুশ্রূষা কারিয়া থাকেন, তাহারা এই যুবকের সেবা-রীতি সম্যক ধারণ করিতে পারিবেন না। তিনি প্রাণের টানে রোগীর জন্য খাটিতেন। এক দিনের দৈনন্দিন লিপিতে লেখা আছে, "মা, প্রাণে প্রেমের সঞ্চার না হইলে রোগিদের সেবা করিব কি করিয়া? অহঙ্কার ত দূর করিয়াছিস্ প্রেম দে মা।" এই অল্প কয়েকটি কথা যুবকের নিরহঙ্কার হৃদয়ের গভীরতা প্রকাশ করিতেছে।

আর এক দিনের (১৯০০, ১০ই সেপ্টেম্বর) বিবরণী হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত হইল।—

"যাইতেই কাছে ডাকিয়া বসাইলেন এবং নিজে হাওয়া দিতে লাগিলেন, পাখাখানা চাহিলে বলিতেন "তুমি ত বরাবরই হাওয়া দেও আজ আমি একটু তোমায় দি"; আমি বলিলাম আপনাকে ত আমি কখনও বেশী হাওয়া দিই নাই। বলিলেন, রোগীদের ত দিতেছ? লজ্জিত হইলাম, কারণ প্রাণ খুলিয়া ত রোগিদের কখনও সেবা করি নাই; যাহা কিছু করিয়াছি সেই জন্য অশ্বিনী বাবু ও ইনি অত্যধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাই শুনিয়া বাস্তবিকই লজ্জায় প্রাণ অভিভূত হয়। রোগিদের বাতাস করায় তাঁহাকে করা হইয়াছে, আহা! কত ভালবাসা মানুষের প্রতি!"

হেরম্ব যথাশক্তি, যথাশক্তি কেন সাধ্যাতিরিক্ত পরের জন্য খাটিতেন। রুগ্ন ব্যক্তিকে এক বিন্দু আরাম দিবার জন্য আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিতেন, তবু তাঁহার মনে হইত—প্রাণ দিয়া খাটিতাম

কই।" "প্রাণ দিয়া ত রোগীর সেবা করি না" ইত্যাদি। প্রেমিক যুবক আপনার উচ্চ আদর্শের তুলনায় সর্ব্বদাই স্বীয় সম্পাদিত কার্য্য অপূর্ণ বলিয়া দেখিতেন তাই অতৃপ্তি সততই তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া থাকিত।

অপর এক স্থলে হেরম্বচন্দ্র লিখিতেছেন—আমার "ভাল আছি" ফুরাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্যই যিনি "আমি" বলিতে সার্দ্ধ তিন হস্ত পরিমিত একটী ক্ষুদ্র জীব না বুঝিয়া স্বজাতি কিম্বা মানবজাতি অথবা জীব মাত্রকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার "ভাল আছি" ফুরাইয়া যাইবে ইহা আর বিচিত্র কি? হেরম্বচন্দ্রের প্রাণ ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িয়া ক্রমশঃ ভূমার দিকে প্রধাবিত হইতেছিল, ইহা নিঃসন্দেহ।

হেরম্বচন্দ্র শুধু নিরাশ্রয় রোগিদের বান্ধব ছিলেন এমন নহে। তাঁহার কোমল হৃদয় দরিদ্র, অসহায় ছাত্রদের জন্য কাঁদিয়া উঠিত। এখনও ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কোন কোন দরিদ্র ছাত্র এই স্বর্গীয় যুবকের পূতচরিত্র মনে করিয়া অতি মাত্র বিষাদিত হইয়া থাকেন। নবাগত দরিদ্র ছাত্রদের থাকিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া, দরিদ্র বালকের জন্য পুরাতন পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, কোন কোন অসমর্থ ছাত্রের বেতনের সংস্থান করা হেরম্বের কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি দরিদ্রের সেবক সম্প্রদায়ের এক বৎসর কাল সম্পাদক ছিলেন এবং চারি বৎসর কাল উক্ত সম্প্রদায়ের সেবক ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বরিশাল সহরে সর্ব্বজনবিদিত, বিনীত ও পরিশ্রমী সেবক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দরিদ্র-সেবক-সম্প্রদায় পূর্ণ গৌরবের সহিত কার্য্য করিত। স্বীয় গ্রামস্থ বাসভবনে অবস্থানকালে হেরম্বচন্দ্র নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের নিরাশ্রয় রোগিদের আশ্রয়স্থল ও পরম বান্ধব বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

কোথায়ও অসহায় রোগী যন্ত্রণা পাইতেছে শুনিলে হেরম্বচন্দ্র ব্যাকুল প্রাণে রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া তথায় উপনীত হইতেন। নিঃস্ব রোগিদের তিনি সময়ে সময়ে নিজে চিকিৎসা করিতেন। এ জন্য যুবক জ্বর, ক্ষত ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা হেরম্বচন্দ্রের নিকট প্রায় সকল সময়ই দু' চার শিশি ঔষধ দেখিতাম। হেরম্বচন্দ্রের স্বগ্রামবাসী শ্রীচন্দ্রকান্ত দে নামক জনৈক ব্যক্তি এক সময়ে ভীষণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার অবস্থা মুমূর্ষু মনে করিয়া চিকিৎসক ও আত্মীয়গণ নিরাশ হইয়া পড়েন। সর্ব্বজন পরিত্যক্ত চন্দ্রকান্তকে হেরম্বচন্দ্র অক্লান্তভাবে শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তাঁহার সেবাগুণে রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয় হেরম্বচন্দ্রের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। এই রঙ্গভূমিতে যুবকের জীবন নাট্যের শেষাঙ্ক অভিনীত হইয়াছে। ব্রজমোহন বিদ্যালয় অদ্যাপি যতগুলি সুসন্তান প্রসব করিয়াছেন, হেরম্বচন্দ্র তন্মধ্যে বোধহয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারেন। এই তেজস্বী যুবকের হৃদয়টি যেন অফুরন্ত উৎসাহের ভাণ্ডার ছিল। হেরম্বচন্দ্র ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের যাবতীয় সাধু অনুষ্ঠানের অগ্রণী ছিলেন। প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে তাঁহার আন্তরিক প্রবল অনুরাগ দেখা যাইত।

"বান্ধব সমিতিতে" দেখা যাইত শ্রোতৃগণ তাঁহার সুরল সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া দুলিতেছেন; Debating Club এ দেখা যাইত যে, বুদ্ধিমান যুবক বাদানুবাদ অধিকতর কৌতুকপ্রদ করিবার জন্য দুর্ব্বল পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক বিপক্ষদের যুক্তি খণ্ডন করিতেছেন; Union-Band এর ভিতর দৃষ্ট হইত হেরম্বচন্দ্র বিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য

নিম্নশ্রেণীর বালকদিগকে চরিত্রবান্ ও অধ্যয়নশীল হইতে উপদেশ দিতেছেন এবং তাহাদের চরিত্রগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতাগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। "ছাত্রবন্ধু" পত্রিকা পরিচালনের সময় দেখা যাইত যে, যুবক চাঁদা আদায় করিয়া এবং সুনীতিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া পত্রিকাটীর বহুল প্রচারের জন্য যত্ন করিতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, তিনি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শুভ কার্য্যে অন্তরের সহিত যোগদান করিতেন। আজকাল যুবকদলের মধ্যে একটা ব্যাধি ক্রমশঃ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে যে, তাহারা প্রত্যেক সাধু চেষ্টাই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। যুবক হেরম্বচন্দ্র কদাচ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। সাধারণের কল্যাণকর যে কোন কার্য্যে তিনি উপেক্ষা প্রদর্শন ত করিতেনই না, সম্ভব হইলে যোগদান করিয়া আপনার আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেন।

হেরম্বচন্দ্রের উদার হৃদয় পর-পদদলিতা ভিখারিণী ভারত-ভূমির দুঃখেও কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। বিদেশী বণিক ভারতের রাশি রাশি অর্থ অর্ণবপোতে বহিয়া আপন আপন দেশে লইয়া যাইতেছেন এবং এ দেশ দিন দিন অধিকতর দরিদ্র হইয়া যাইতেছে, এ সত্য হেরম্বচন্দ্র বিশেষ-ভাবে অনুভব করিতেন। তিনি তাঁহার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি স্বদেশজাত পাইলে কদাচ বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিতেন না। তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে বলিতেন এবং কখন কখন বাজারে লইয়া যাইয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দিতেন।

হেরম্বচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময়ই অধ্যয়ন সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। বহু অনিবার্য্য কারণ পরম্পরায় যুবক কদাচ নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়মানুযায়ী অধ্যয়ন করিতে পারিতেন না। এই সকল কারণ মধ্যে

তাঁহার পুরাতন উদরাময় রোগই সর্ব্বপ্রধান। এই জন্য তাঁহাকে সুযোগ মতে অধ্যয়ন করিতে হইত। কোন ধারাবাহিক নিয়মের অধীন না হইলেও তিনি নিতান্ত অধ্যয়নানুরাগী ছিলেন এ বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে রোগী সেবা ও অপর কার্য্যাদি সাধন করিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতে অবসর পাইতেন কিরূপে? এ কথার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, রোগি-সেবা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সেবকগণ নিরাশ্রয় রোগী মাঝে মাঝে পাইয়া থাকেন। তারপর উদ্যোগী কর্ম্মী পুরুষের কথনও সময়ের অভাব হয় না। কর্ম্ম-কুণ্ঠ অলসেরাই অপরের জন্য খাটিবার অবসর করিতে পারেন না। প্রকৃত কর্ম্মী আপনার শত শত কার্য্যের ভিতরেও পরের কথা ভাবিবার অবসর করিতে পারেন। হেরম্বচন্দ্র খাটিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন এবং খাটিতে খাটিতেই জীবলীলা শেষ করিয়া গিয়াছেন।

অতুলনীয় ধীশক্তি লাভ হেরম্বচন্দ্রের আদর্শের অন্তর্ভূত বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্ঞান-পিপাসু যুবক আপনার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক কয়েকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। দেশীয় বিদেশীয় মহাপুরুষের জীবন-চরিত Wordsworth, Carlyle, Emerson, Tennyson প্রভৃতি চিন্তাশীল মনীষিগণের গ্রন্থাবলী যুবকের নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছিল। উপন্যাস এবং নিম্নশ্রেণীর লেখকদের তরলভাবপূর্ণ কবিতা পাঠ করিতে তিনি ঘৃণা বোধ করিতেন। অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও তিনি ইতিমধ্যেই Tennyson's works (গ্রন্থাবলী), Carlyle এর দুই এক খানি পুস্তক এবং দেশীয় লেখক-গণের কোন কোন পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন।

হেরম্বচন্দ্রের অধ্যয়ন প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। উল্লিখিত সুপণ্ডিত লেখকগণের পুস্তক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন। নিতান্ত দুরূহ স্থান গুরুজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। পঠিত পুস্তকের যে যে অংশ হৃদয়গ্রাহী হইত উহা স্বীয় সম্পত্তি করিবার মানসে একখানি খাতায় তুলিয়া রাখিতেন। এইরূপ উদ্ধৃত বাক্যের সংগ্রহ দ্বারা তিনি একখানি সুবৃহৎ পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। সেই পুস্তকখানি তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা ও অধ্যয়নানুরাগ প্রকাশ করে। দেশীয় লেখকগণের পুস্তকাবলীর মধ্যে রসলীলা, জীবনবেদ, প্রকৃত বিশ্বাস (True faith), প্রসাদ সঙ্গীত, বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী ও কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড বেদ তিনি আনন্দ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হেরম্বচন্দ্র ছাত্রবন্ধু পত্রিকায় সুনীতিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার লেখা সুরুচিপূর্ণ সরল ও হৃদয়গ্রাহী। এই পত্রিকায় তিনি ইংলণ্ড দেশের আদর্শ শিক্ষক ডাক্তার আর্ণল্ডের জীবনচরিত লিখিতেছিলেন। প্রতি কার্য্যেই যুবকের উন্নত হৃদয়ের গভীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হইত। হেরম্বচন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী যুবকের পক্ষে ক্ষমতাশালী লেখক হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এ ছাড়া তাঁহার রচিত প্রায় পঞ্চাশটী ধর্ম্ম সঙ্গীত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সঙ্গীতগুলি যুবক বালকদের কণ্ঠে বরিশালে ও অপর কোন কোন স্থানে গীত হইতে শুনা যায়। এই গানগুলি আজিও বহুলরূপে প্রচারিত হয় নাই। হেরম্বচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন বর্ণনা করিবার সময়ে আমরা এই সঙ্গীতগুলির পুনরালোচনা করিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগ ও বিস্তারের ভাব।

হেরম্বচন্দ্র বাল্যকালেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বালক পবিত্র, পুষ্পিত তরুতলে বসিয়া বিশ্রাম দিনে শ্যামল শস্য ক্ষেত্রের শোভা দেখিতে ভালবাসিতেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে এই অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উন্মত্ততায় পরিণত হইয়াছিল। যুবক হেরম্বচন্দ্র সামান্য বৃক্ষপত্র ও পুষ্পাদি যেরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন তাহা সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে না। তাহার মৃত্যুর পরে পুস্তকাদির ভিতরে কয়েকটী পত্র পাওয়া গিয়াছিল। একজন বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি ঐ পত্র কয়েকটী এবং একখানি ছবি একত্রে আয়নার ভিতরে বাঁধিয়া রাখিতে অভিলাষী।

নিম্নোদ্ধৃত বাক্য কয়েকটী যুবকের প্রাণের গভীর সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রমাণিত করিবে—(১৯০১।১৬ই জানুয়ারী) "দূর হইতে মহামায়ার বাড়ী দেখিয়া কত আনন্দ হইল! যাইয়া জঙ্গলের দিকে চাহিয়া আরও আনন্দ! কোথা হইতে যেন সুমধুর গন্ধ আসিয়া আমোদিত করিয়া তুলিল! খুঁজিতে খুঁজিতে কুমারীলতার কাছে যাইয়া দেখিলাম যে, সে অপূর্ব্ব শোভাময়ী হইয়া রহিয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলগুলি সুগন্ধে সমস্ত বনটাকে যেন আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। আর থাকিতে পারিলাম না—অমনি একটী ছিঁড়িতে গেলাম, কিন্তু কেন জানি সেই সময়ে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলাম। মনে

করিলাম কি অন্যায়ই করিতেছি ;" হেরম্বচন্দ্র প্রাকৃতিক বস্তু নিচয়কে এরূপ প্রাণের সহিতই ভালবাসিতেন। মানুষ মানুষকে যেরূপ ভালবাসিয়া থাকেন, তিনি বৃক্ষ, লতা, পত্র ও পুষ্পাদি সেইরূপ ভাবে ভালবাসিতেন।

আর এক দিনের (১৯০০।৯ই সেপ্টেম্বর) বিবরণ হইতে কয়েকটি কথা নিম্নে প্রদত্ত হইল। "ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় যাইবার জন্য শরৎ আমাকে বলিল, প্রাণ যেন অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, তবুও মনে করিলাম যদি হয় যাব একবার। এই অনিচ্ছার কারণ আমি জানি না। অনেক দিন পরে নদীর তীরে যাইয়া দেখি—"পূরব আকাশ চিরিয়া চিরিয়া উঠিছে শারদ শশী।" দেখিয়া বড়ই সুখ হইল। কে কার ধর্ম্মরক্ষিণীতে যায় ? কে Prayer করিতে ৭ টার পুর্ব্বে বাসায় ফিরে? চোকই তখন রাজা হইল, কয়েদীর মত চাঁদের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছি বটে, কিন্তু স্মৃতি হইতেছে না ; কেবল জোরে কর্ম্ম।

যাইতে যাইতে সাগরদির পথে যাইয়া একটি ঝাউ গাছের নীচে হেলান দিয়া নদীবক্ষে প্রতিফলিত চন্দ্রকিরণের প্রাণ-উন্মাদিনী শোভা দেখিতে লাগিলাম। চাঁদের তরল জ্যোৎস্না প্রাণ উন্মাদিনীই বটে! তবে প্রাণ বিশেষে উন্মত্ততারও বিশেষত্ব হইয়া থাকে। আজ যদি আমি, এই আমি না হইয়া, এমন আমি হইতাম, যে আমি ভগবানকে এই সমগ্র জগতের স্রষ্টা বলিয়া দর্শন করেন, যে আমি সমস্ত প্রাণটা দিয়া ভগবানকে ভালবাসেন, তাহা হইলে এই চাঁদ দেখিয়া বাস্তবিকই একপ্রকার উন্মত্ততা জন্মিত—ভগবান্ নিজেই সেই উন্মত্ততার পরিচয় দিয়াছেন—"গগনের চন্দ্র দেখেরে রাধা বলে ধরতেঁ যায়।" বেড়াইতে

যাওয়ার সময়ে কোন কোন যায়গা দেখিয়া আমার প্রাণে কেমন একটি ভালবাঁসার ভাব আসিয়াছিল, তাহার কারণ কি? আমি একজনকে ভালবাসিতাম, ঐ সকল স্থান তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট (Associated) তাই ঐ সকল অচেতন স্থানগুলিও মধুর হইয়াছে। যাহাকে ভালবাসি সে মধুর, তাহার পরিবার মধুর, তাহার বন্ধুবর্গ মধুর এবং তাহার সম্পর্কিত যাহা কিছু সবই মধুর। আজ বুঝিলাম মানুষ কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থলে যাইবার জন্য এত পাগল হয় কেন? কিন্তু চাঁদ কি আমার নিকট সেই জন্য মধুর? চাঁদ কি আমার ভালবাসার পাত্রের জিনিষটি, এই বলিয়া মধুর? না, যদি তাহা হইত তবে চাঁদ দেখিলে প্রাণের দুয়ার খুলিয়া যাইত; চাঁদ দুয়ার খুলিয়াই বিদায় হইত আর আমি সেই সুন্দর "বরেণ্যং" টিকে দেখিতে দেখিতে মজিয়া যাইতাম!

কিন্তু সেই দেখা দেখিলাম কই? কেমন করিয়া দেখিব? চাঁদ যাঁর তাকে ত আর ভালবাসি না—অন্ততঃ সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য ভালবাসা ত আর তাঁর সঙ্গে নাই। কেবল বুদ্ধি-শক্তির সাহায্যে (Intellectually) আর কতক্ষণ চাঁদ দেখিতে পাওয়া যায়? ভাবের সাহায্যে (Emotionally) দেখাই আনন্দপ্রদ। ভাব কই—কেবলমাত্র দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে প্রাণে যে সুখের (Sensual pleasure) অনুভূতি হয় তাহারই অধিকারী আমি। কিন্তু আজ চাঁদ দেখিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের যে সুখ পাইয়াছি তাহাও কম নহে। ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া আছি, একখানা জাহাজ ঐ সোণামাখা জলগুলি চিরিয়া চিরিয়া চলিয়া গেল—বোধ হইল যেন জাহাজ উহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কি বলিয়া গেল। যেমন জাহাজখানা স'রে গেল অমনি জলেরা জ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়া গেল—মনে করিলাম জাহাজ বুঝি জলগুলিকে জ্যোৎস্না করিয়া দিয়া গেল এবং

সারি সারি হইয়া উত্তর দিকে উড়িয়া গেল। (এ গুলি জলের ঢেউ, জ্যোৎস্নামাখা)। এ দৃশ্য বাস্তবিকই আনন্দপ্রদ। তখন এক একবার ইচ্ছা হইল যে, আমি যদি ওখানে থাকিতাম তবে আমিও ঐ আলোকময় Trainএর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিতাম। অবস্থা যে কি তখন লিখিতে পারি না। এর মাঝে মাঝে ভগবানকে ডাকিয়া বলিতেছি "তু মহিমাময়।" এ ডাক বাহির করিতে ইচ্ছাশক্তির দরকার হইয়াছে। আপনা আপনি প্রাণ হইতে "তু মহিমাময়" ডাক বাহির হয় নাই।

এই মহিমাময় বিকাশের তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না, এই মহা সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে কি একটা শক্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নীলাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি, সবুজ বৃক্ষ লতাগুলি, আজকালের চাঁদটি এ সব কেন সুন্দর? এরা ত আমার নয় বা আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কও নাই। তবে আমার আনন্দ হয় কেন? এই সব কথা মনে উঠে। চাঁদ দেখিতে দেখিতে এই প্রকার কত কি ভাবিলাম।"

যুবকের আত্ম-দর্শনশক্তি কিরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, উপরের কথাগুলি তাহাই প্রকাশ করিতেছে। আপনার ভিতরের চিন্তাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি উহার সদসৎ নির্দ্ধারণের ক্ষমতার কি সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! এবম্বিধ আত্ম-পরীক্ষার ক্ষমতা তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির পরিচায়ক। তত্ত্বদর্শী হেরম্বচন্দ্র প্রকৃতি দর্শনের ভিতরে সৌন্দর্য্য-বিলাস (সুন্দরকে কেবলমাত্র সুন্দর বলিয়া ভালবাসা) লক্ষ্য করিয়া কিরূপ মর্ম্ম-পীড়িত হইলেন। পাঠকগণ উপরের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির বহিরাবরণের সৌন্দর্য্য-লালসা ছাড়িয়া ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ

করিবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন। যুবক উত্তরোত্তর বিশাল প্রকৃতির অন্তরালে আপনার পরম সুন্দর দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছিলেন। নিম্নে তাঁহার রচিত দুইটি সঙ্গীত ইহার যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য উদ্ধৃত হইল,—

বেহাগ—একতাল।

কে তুমি আড়ালে ?
চন্দ্রমারে দিয়ে হাসি, নীলাকাশে তারারাশি
কে তুমি বিরলে বসি আমারে মজালে ?
যখন যাহা চাই আমি অমনি তা' দিচ্ছ তুমি
কেবল দেখা দিতে চাও না ভালবাসি না বলে।
ভালবাসা শিখাও মোরে লুকিয়ে আর থেক নারে
দেও দেখা, প্রাণসখা হৃদি কবাট খুলে।

দ্বিতীয় সঙ্গীতটীতে যুবক এক জ্যোৎস্না-ধবলা শারদী রজনী বর্ণনা করিতে করিতে উপসংহারে বলিতেছেন—

হাসি হাসি কেবল হাসি
যে মুখ থেকে আস্‌চে ভাসি।
তারই তরে প্রাণ উদাসী
বা'র হয়েছে দেখ্‌ব ব'লে॥

হেরম্বচন্দ্রের সেবাব্রত আলোচনার সময়ে আমরা দেখিয়াছি তাঁহার উদার হৃদয় সীঙ্কর্ণ গণ্ডীবদ্ধ ছিল না। উহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া আপনার সহিত দেশের ভাবনাকেও আপনার করিয়া লইতেছিল। তাঁহার হৃদয়ের চির জাগ্রত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই তাঁহাকে বলিয়া

দিত—"যো বৈভূমাতৎ সুখন্ নাল্পে সুখমস্তি" পরিমিত বস্তুতে সুখ নাই। যুবকের প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয় যে ভূমানন্দের আস্বাদন পাইয়া ক্রমশঃ দিগন্তব্যাপী হইতেছিল তাহার সম্যক্ বর্ণনা করা সম্ভব নহে। যাঁহার উদার হৃদয় স্বীয় গৃহের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের কথা স্বতঃই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই অনন্ত সুখের পূর্ব্বাভাস তিনি পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বজাতির স্বদেশের, মানবজাতির কিম্বা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ কামনা যাঁহাদের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে, প্রাণটী বিশ্বব্যাপী হইলে কি গভীর আনন্দ তাঁহারই উহা অনুভব করিয়া থাকেন। মানব-জীবনে এমন অনেক শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয় যখন মানুষ মনে করেন যে, তাঁহার আমিত্ব ক্ষুদ্র দেহের ভিতর বদ্ধ থাকিবার জিনিষ নহে। "আমি" শনৈঃ শনৈঃ এতদূর প্রকাণ্ড হইয়া উঠে যে, ইহার প্রসারিত আয়তনের তুলনায় ক্ষুদ্র দেহ, ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ এমন কি সসীম পৃথিবীও নিতান্ত পরিমিত স্থল বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। মনে হয় আমার "আমি" যেন দেহকারাগার ভাঙ্গিয়া অসীম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে।

হেরম্বচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনী পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, শুভ মুহূর্ত্তে যুবক এবম্বিধ বিস্তারের ভাব উপলব্ধি করিতেন। একদিনের (১৯০১।১৭ আগষ্ট) বিবরণ হইতে নিম্নে কয়েকটী কথা প্রদত্ত হইল—

"চন্দ্রকান্তকে লইয়া বাহির হইলাম, বিছানাখানা পাতিয়া রাখিয়া গেলাম যদি কেহ খোঁজে ত মশারি দেখিয়াই ফিরিবে। আর লুকাইয়া পলাইতে বড়ই কৌতুক পাই। যাইতে যাইতে দেখি আকাশে সামান্য একটুকু মেঘ, এখন ক্রমে ক্রমে ঘন হইয়া সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাতাসও উঠিয়াছে, বিন্দু বিন্দু ঘন ঘন বৃষ্টি

হইতেছে। ফিরিলাম না, যাইতে লাগিলাম; দেখিতে দেখিতে আকাশ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কার হইল, অগণন নক্ষত্র আকাশে ফুটিয়া উঠিল। নদীর ধার দিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পবিত্র আনন্দরেখা মাঝে মাঝে প্রাণস্পর্শ করিতেছিল। ঝাউয়ের গম্ভীর দৃশ্য এবং সোঁ সোঁ তান বড়ই সুন্দর। যাইতে যাইতে পুলের উপর বসিলাম, বসিয়া বসিয়া বিশ্বপতির অপূর্ব্ব শোভাময় সৃষ্টি দেখিতে লাগিলাম। কত কি ভাব মনে আসিল, তন্মধ্যে বিস্তারের ভাবটী নূতন। তারাগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কোন কোন মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল যে, আমি যেন পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশে যাইয়া এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছি যে, এক সময়ে অনেকগুলি নক্ষত্রে থাকিতে পারি। ঐ বিশালত্বের সহিত তুলনা করিয়া আমি আমার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না।"

প্রাণটী ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িয়া ভূমার দিকে প্রধাবিত না হইলে কেহই এই বিস্তারের ভাব অনুভব করিতে পারেন না। হেরম্বচন্দ্রের উন্নত হৃদয় সর্ব্বদা চিন্তার সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসতি করিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মজীবন, চরিত্রবল ও তাহার প্রভাব।

আপনার জীবনের উচ্চ লক্ষ্যের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া যুবক হেরম্বচন্দ্র এক স্থলে বলিয়াছেন যে, আদর্শানুযায়ী আত্মগঠন করিতে হইলে তাঁহার জীবন ভগবৎভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া প্রয়োজনীয়। হেরম্বচন্দ্র তাঁহার জীবনের দিনগুলি যেরূপভাবে যাপন করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিতে পারিতেন—

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নাং সায়াহ্নাৎ প্রাতরেবহি।
যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনং॥

উপাসনা, কীর্ত্তন ও নাম জপ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সার কথা। তিনি আপনার দৈনন্দিন জীবনীর এক স্থলে লিখিয়াছেন:— "আত্মা ভগবৎমুখীন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে বীরজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করার নাম উপাসনা। আপন আপন হৃদয়ের মধ্যে একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা যাহা কিছু করি, সকলই তাঁহার উপাসনা। অধ্যয়নের সময়ে মনে করিতে হইবে, ভগবৎ বিধান অনুযায়ী তাঁহারই তত্ত্বশিক্ষা করিবার জন্য জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছি; অঙ্গচালনার সময়ে মনে করিতে হইবে যে, তাঁহারই কার্য্য সাধন করিবার জন্য দেহ কষ্টসহিষ্ণু, কর্ম্মক্ষম ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য ব্যায়াম করিতেছি। প্রতি কার্য্য করিবার সময়ে আমাদের মনের গতি এবম্বিধ হইলে সর্ব্বদাই আমরা উপাসনাপরায়ণ হইতে,

পারি। যদি কেহ অশ্রুপ্লুত হইয়াও বৃথাবাক্যে ভগবানের উপাসনা করেন তবু তিনি প্রকৃত উপাসনার উচ্চভূমি হইতে বহু নিম্নে অবস্থিত। তেজহীন ব্যক্তি কখনও উপাসনাদ্বারা লাভবান হইতে পারেন না। উপাসনা ব্যর্থ বাক্যোচ্চারণ নহে, প্রকৃত কার্য্য সাধন। প্রার্থনা সর্ব্বপ্রকার বাসনামুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।"

কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত ধর্ম্মালোচনার জন্য হেরম্বচন্দ্র এক গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। আপন আপন জীবনের উপলব্ধ সত্যের আলোচনাদ্বারা পরস্পরের সাহায্য করা এবং সংযম ও সরল ধর্ম্মনীতি সাধনদ্বারা বল সঞ্চয় করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল।

অতি নিভৃত স্থলে স্বায়ংকালে কিম্বা রজনীযোগে এই সমিতির অধিবেশন হইত। এই গুপ্ত সমিতিতে তিনি আপনার বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছে স্বীয় ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন নিম্নে তাহার দুই একটী কথা উল্লেখ করিব :—

একদিন উপাসনার কথা উঠিয়াছিল। হেরম্বচন্দ্র ভগবানের কাছে আপনার দুর্ব্বলতার কথা নিবেদন করিয়া কি প্রকারে মোহ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আপনার জীবনের একাধিক দিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, সরল ও ব্যাকুল প্রাণে উপাসনা করিলে হাতে হাতে ফল লাভ হয়।

আর একদিন কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। একজন প্রশ্ন করিলেন সংকীর্ত্তনে কে কিরূপ আনন্দ পাইয়াছেন? উত্তরে হেরম্বচন্দ্র বলিয়াছেন যে ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় তিনি একদিন কীর্ত্তন করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন সেই নির্ম্মল আনন্দ তিনি সাত দিন আপনার

ভিতরে অনুভব করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁহার দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিতেছেন—

"ভগবানের একটু কৃপাদৃষ্টি এই দিকে পড়িল আর মহাসঙ্গীতের রোল উঠিয়া গেল। এই প্রকার কীর্ত্তন জীবনে অনেক দিন হয় নাই "মা, মা বলে এবার ঝাঁপ দিব গো" বলিয়া সকলেই গাইতেছিলাম, শরীরের সমস্ত শক্তি ও যথাসম্ভব মনের শক্তি দিয়া গাইয়াছি। এই কীর্ত্তনের ক্রিয়া প্রায় ২।৩ দিন একটু একটু অনুভব করিয়াছি।"

যে দিন এই কীর্ত্তন হইয়াছিল, সে দিন আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম। তেমন প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তন আর শুনিয়াছি মনে পড়ে না। প্রেমিক হেরম্বচন্দ্র আত্মহারা হইয়া একদিকে গাইতেছেন, পশ্চাতে বহু যুবক উন্মত্তবৎ গান করিতেছিলেন। সে দিনের সেই দৃশ্য ভুলিবার নহে, সভায় প্রেমের উৎস ছুটিয়াছিল। নিতান্ত পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিও সে দিন গলিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গের কেহ বা ভাবাবেশে ঢুলিতেছেন, কেহ বা উন্মত্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছেন! শ্রোতা ও গায়ক উভয়দলই আত্মহারা। এইরূপে বহু সময় কীর্ত্তন চলিয়াছিল।

পাপবোধ যাহার যত প্রবল তিনি ধর্ম্মজীবনে ততদূর অগ্রসর হইয়াছেন। সাধারণ মানুষ যাহাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র পাপ বলিয়া উপেক্ষা করেন, সাধুব্যক্তি তাহাকে মহাপাপ মনে করিয়া আত্মকৃত অপরাধের জন্য বিবেক-দষ্ট হইয়া থাকেন। অনুষ্ঠিত পাপের জন্য গভীর অনুতাপ ধার্ম্মিক ব্যক্তির একটা লক্ষণ বলা যাইতে পারে। বহু কুক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির পাপ বোধ একরূপ নাই বলিলেই চলে। বোধ থাকিলেও অনুভূতির গভীরত্ব নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, আত্মকৃত অতি ক্ষুদ্র পাপ সাধুর হৃদয়ে এবম্বিধ তীব্র জ্বালা তুলিয়া দেয় যে,

তিনি তজ্জন্য অধীর হইয়া উঠেন। মাকড়সা যেমন তাহার জালে ক্ষুদ্র পোকাটী পড়িলেও তৎক্ষণাৎ টের পায়, ধার্ম্মিক ব্যক্তিও তাঁহার হৃদয়ের এক কোণে অতি ক্ষুদ্র একটী পাপ উঁকি মারিতে তখনই উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। হেরম্বচন্দ্র আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপগুলি অতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতেন এবং তাঁহার আত্মদৃষ্টি দিন দিন প্রখরতর হইতেছিল। একদিকে স্বকৃত পাপগুলির জন্য অনুতাপ, অপরদিকে সর্ব্বশক্তিমান্ প্রেমময় পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস হেরম্বচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের বিশেষত্ব বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনী হইতে উদ্ধৃতাংশগুলি ইহাই প্রমাণ করিবে—

(১৯০১—২১শে জুলাই) "আজ ক্ষণকালের জন্য একটু ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সবই বিষাদজনক, সবই নিরাশাপ্রদ। আমি ছাত্র হইয়াছি কিন্তু শক্তি অনুসারে জ্ঞানার্জ্জন করি নাই। নৈতিক দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, বুঝি অনেক বিষয়, জানি অনেক বিষয়, কিন্তু স্থির মাল একটুও জমা হয় নাই বলিলেও দোষ হয় না। কারণ আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, আমি ঘুষখোর হওয়া, চুরি করা, মানুষকে ঠকাইয়া পয়সা আদায় করা ইত্যাদি পাপ করিতে পারি না। বিশ্বাস করিতে বোধ হয় পারি না যে, আমাদ্বারা কোনও স্ত্রীলোকের সতীত্বের প্রতি অত্যাচার হইতে পারে না অথবা তাহার কুহকে পড়িয়া আত্ম-বিনাশ করিতে পারি না। একটু বহির্ভাগে চাহিয়া দেখি শরীর সর্ব্বদাই ব্যাধির অনলে দগ্ধ হইতেছে। মানুষের মত মুখশ্রী আমায় পরিত্যাগ করিয়াছে। ভগবান্ আমাকে সৌন্দর্য্য দিয়া একটুক সুন্দর দেখিবেন বলিয়া (মালী যেমন বাগানে সুন্দর ফুল ফুটিতে দেখিবার আশায় থাকিয়া নিরাশ হইলে দুঃখিত হয়) আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার

এই দশা দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইতেছেন। বোধহয় চিরদিনের জন্য আমাকে ছাড়িয়াছেন।

যাঁহাকে নমস্কার করিয়া আরম্ভ করিয়াছি তাঁহাকে, সেই সর্ব্ব-শক্তিময়ীকে বলিতেছি, যদিও আমি তোমায় অনুভব করি না যে, তুমি আছ, যদিও আমি আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া ঘুমাইয়া আছি, তুমি আমার প্রাণে তীব্র আগুন জ্বালাও। তীব্র অনুভূতি শক্তি জাগাইয়া তোল। আমার কুটিলতা দগ্ধ করিয়া ফেল। ভান করিবার ইচ্ছা ও ক্রিয়া (Tendency) নষ্ট করিয়া ফেল। আমায় অনুভব করিতে দেও যে, আমি পাপ করিতেছি। আমায় মুহুর্ম্মুহু তোমার নাম করিয়া হৃদয় পরিষ্কার করিতে দাও। না, কেমন করিয়া হৃদয় পরিষ্কার হইবে তাহা আমি বলিব না; কারণ আমি জানি না কিসে কি হয়। আমার যতটুকু শক্তি আছে শত অনিচ্ছা থাকিলেও তোমাকে বলিতেছি মা, আমার ধরে তোল; মানুষ কর, শক্ত করে ধর।

আমি শত অপরাধ করিয়াছি মানিলাম, কিন্তু "আমি পাপী" "আমি দীনহীন" বলিয়া রোজ কাঁদিলে, আর সেই পাপে ডুবিয়া থাকিলে কি হইবে? কি হইবে বাস্তবিক ব্যথা না পাইয়া কান্নার ভান করিলে? মা, যদি বাস্তবিক ব্যথা বুঝিতাম তবে কি আর সেই কাজ পুনঃ পুনঃ করিতাম। আমার অনুভূতি নাই। তবে কেন যেন মাঝে মাঝে বুঝিয়া ফেলি যে, পাপ করিতেছি, ইহা তোমারই দয়া। মা, তেমি বোঝা বুঝাও যে আর যেন কু-পথে না যাই; তেমি তেজ প্রাণে জাগাইয়া দেও যেন সর্ব্বদা চেষ্টা করি যে কিছুতেই মন কু-পথে না যায়। যাইতে চাহিলে যে পদাঘাত করিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারি। জাগাও, আর কত ঘুমা'ব? যেমন বুঝিব "আমি পাপী" তেমন সর্ব্বদাই এই ভাব

প্রাণে জাগিয়া থাকিবে যে, তোমার পুণ্যময় নামের গুণেই হউক কি যে প্রকারে হউক পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেই হইবে। তোমার কাছে আর ঘুমের ঘোরে কাঁদিতে চাহি না। উত্তর দাও, কথা কও, যদি না কও এই লাগিলাম ঘন ঘন শ্বাসে শ্বাসে তোমার নাম করিয়া করিয়া তোমায় অস্থির করিয়া তুলিব। পাপী বলিয়া আমি ডাকিলে তুমি না আসিয়া পাড়িবে কি? আমি সর্ব্বদা তোমায় স্মরণ করিলে তুমি ভুলিয়া থাকিতে পারিবে কি?

আর যদি দয়া করিয়া ভুলাইয়া তোমার দিকে লইয়া যাও তবেত সৌভাগ্যের সীমা নাই। মাগো, তুমি বাঁশী, মোহন মধুর বাঁশী বাজাইয়া শত শত গোপীদেরে লইয়া গেলে। আহা, কি আনন্দ! কিন্তু তাহারা সরলা, আর আমি কুটিল, ভানময়। তুমি মাতাল মাধাইএর মার খেলে, তবুও তারে কোলে করে তোমার প্রেম-সুধা-দানে চরিতার্থ করিলে। সেও আমার চেয়ে ভাল, তাহা না হইলে তোমার এমন অযাচিত প্রেম পাইল কেন? মা, আমি যা হই, যত নীচ হই, যদি আমার মত পাপী ও অধম আর জগতে যদি নাও থাকে, তবুও তোমাকে বলিতেছি আমার প্রাণে একবার পদার্পণ কর। তোর ঐ ভীষণ অসির আঘাতে আমার অহঙ্কার ও মিথ্যাভাব সংহার কর্, সরলতা দে, আমার শূক্ষ্মবুদ্ধিগুলির যাহা হয় একটা কর্, যেমন করে পারিস্ একবার টেনে তোল। আর তোর খোসামুদি করিতে পারি না। তোর কিছু দেখিতে পরি না, বুঝিতে পারি না, কোথায় লুকাইয়া আছিস্ আর আমি কেবল অন্ধকারে বসে কাঁদ্‌ব, তা হবে না। এবার ঘন ঘন মুহুর্ম্মুহুঃ শ্বাসে শ্বাসে ডাকিয়া ডাকিয়া তোমায় অস্থির করিয়া তুলিব। ভাইদেরও এই পরামর্শ দিব। খারাপ হইয়াছি বলিয়া আর ভাবিলে কি

হইবে? পাপের ভাবনা করিয়া পাপ বাড়াইবে কেন? যাহা করিয়াছি ত করিয়াছি এখন দেখি তুমি কতদূরে" !!

(১৯০১।১২ই জানুয়ারী)......অন্যত্র হেরম্বচন্দ্র লিখিতেছেন :—

"দুঃখান্তক সুখ ছাড়িতে পারিব না কেন? মা, পথ দেখাইয়া লইয়া যাও। তুমি আমায় শীঘ্র নেও। আমি অপবিত্র? পাপ করিয়াছি? প্রায়শ্চিত্ত কি? জ্বলন্ত আগুন? আচ্ছা, তুমি আগুনের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাক, আমি ঝাঁপ দিব। উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্র? ডাক, ডুবিব। আঁধারে থাকিয়া পারিব না, আলো দেখাও, শক্তি দেও, যাহা বলিবে করিব।"

স্থানান্তরে তিনি আপনাকে আপনি বলিতেছেন—

(১৯০১—৪ঠা জানুয়ারী)—"পাপের আবার ভয় কি? তুমি ছায়ায় ব্যাঘ্র ভাবিয়া, অবস্তুতে বস্তু ভাবিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইতেছ কেন? পাপ দুর্ব্বল, কেহ বলে দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতায় আবার ভয় কি? তোমার অপেক্ষা শক্তিশালী ভিন্ন আর তোমার ভয় কাকে? তুমি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়, প্রাণ হইতে যখন শক্তিরূপা মাকে তাড়াইয়া দাও, তখনই পাপ বা দুর্ব্বলতা আসিয়া তোমার ঘাড়ে চাপিয়া বসে। মা কত কত ভাবে পরশমণি হইয়া ছড়াইয়া রহিয়াছেন, চাহিতে চাহিতে প্রাণ ব্যাকুল হইলেই একটী পরশ পাইয়া সোণা হইয়া যাইব। পাপ তখন কোথায় পলাইবে বুঝিয়াও উঠিতে পারিবে না। দেখ, ঐ গৌরাঙ্গ পরশমণির পরশে কত লোহা সোণা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গ মরুভূমি মধুর রসে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে। আরো কত মণি আছে। রামকৃষ্ণ মণির পরশ পাইয়া এখনও কত সোণার পুতুল তোমার চক্ষের উপর নাচিতেছে দেখ নাকি? মণি বলিয়াছেন—"সহস্র বৎসরের অন্ধকার

ঘরেও প্রদীপ জ্বালিলে জোৎস্নাময় হইয়া যায়।” দেখ একবার ব্যাকুল হইতে পার কিনা ?”

(১০ই এপ্রিল, ১৯০১)—অপর এক স্থানে হেরম্বচন্দ্র ব্যাকুল প্রাণে মাকে বলিতেছেন—“মাগো জীবনের দিনগুলি যে দৌড়িয়া যাইতেছে। আমায় কি করিলি, কত আর প্রতিজ্ঞা করিব ? কত ভাঙ্গিব মা, আর অাঁধারে থাকিতে পারি না, আমারত আজ তেইশ বৎসর তিনমাস চলিয়া গেল ; কই, এখনওত গন্তব্য স্থান দেখাইলে না ? পথ দেখাইলে না ? মা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমায় তোমার নিকট বিক্রী করিব, না, দান করিব। বিক্রী করিয়া চাহিব কি ? মৃত্যু ভয় কেন ? জীবন কি আমার ? এ জীবন যখন তোমার, তুমি লইয়া যাও। আমি আর কিছুই চাই না, কেবলমাত্র জানিতে চাই যে, আমার জীবন দ্বারা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, কেবল বুঝিতে চাই যে কি করিলে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন যাইবে না। মা, আজ বছরের শেষ দিনে আমাকে এই জ্ঞান দাও। অচল বিশ্বাস কই ? তোমাগত প্রাণ কই ? যাহা হয় মা শীঘ্র কর, আর দেরী সয় না।” ৩১শে চৈত্র, ১৩০০ সন।

(১২ই আগষ্ট, ১৯০১)—অন্যত্র তিনি মাকে বলিতেছেন—

“তোর এই অহঙ্কারপূর্ণ মোহান্ধ সন্তানকে কি একবিন্দু দয়া করিলে দোষ আছে ? মাগো, এই নিরাশার মধ্যে যখন ভাবি যে, একবার যদি মায়ের কৃপা প্রদীপ প্রাণে জ্বলিয়া উঠে, তবে কোথায় পালাইবে মোহ কাম, কোথায় যাইবে গর্ব্ব ; আমি কেবল মায়ের হইয়া যাইব। তখন যে কি আনন্দ পাইব তাহা তুইত প্রাণের মধ্যে বসিয়া দেখিবি। আর তুই বুঝি এখন হাসিস্ যে, বৃথা চিন্তা করিয়া, কেবল পাগলের মত হাসিতেছে, কেন মা, বৃথা চিন্তা কেন ? একদিন কি দয়া করবি

না? আবার যখন ভাবি আমার এই মোহ কামের শক্তি দিয়া যদি তোকে ভালবাসিতে পারি, তবে আর সে স্রোত থামিবে না। আমার পাঁজর ভাঙ্গিয়া ছুটিবে ভাব-স্রোত, আহা সে দিন কবে হবে"।

১৯০১ সনের ৫ই নবেম্বর হেরম্বচন্দ্র আপনার শেষ দৈনন্দিন লিপি লিখিয়া গিয়াছেন। সে দিন তিনি লিখিতেছেন—"প্রাণারাম, তোমারে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তুমি আমায় এমন করিয়া ফেলিয়াছ যে তোমায় ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না। তোমারে ছাড়িয়া ভালবাসিতে যাই, প্রাণ ঢালিয়া দেই, সুখ পাই না। তীব্র জ্বালায় প্রাণ ঝালা পালা করিয়া উঠে। ভাষা সেই জ্বালা কি ব্যক্ত করিবে, কেবল যে জ্বলিয়াছে সে জানে, নিভিয়াও জ্বলে, জ্বলিয়াও জ্বলে, আর তুমি বোধ হয় চোখের আড়ালে থাকিয়া মুচকিয়া হাসিতে থাক। বাস্তবিক এ প্রাণে তোমারই অধিকার, তাই তুমি ছাড়া আর যাহাকে দেই সুখ পাই না।

সুখময়, তোমারে ছাড়িয়া সুমধুর সুস্বাদু কত কি খাই, সব ছাই সব বিষ হইয়া যায়। আর নিরন্তর আমায় তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে ফেলিয়া যে ভাজিয়া তুলিতেছে, আমি অন্ধ তোমারে দেখিতে পাই না, সুতরাং তোমারে লইয়া খাইব কি করে? আর আড়ালে বসিয়া হাসিও না।

জ্ঞানময়, তোমারে ছাড়িয়া পড়িতে যাই আর দুনিয়ার যত বাজে কথা আসিয়া আমার মনটাকে দূরে নিয়া যায়। পড়িয়া পড়িয়া মাথা নীচু হইয়া যায়, শরীর হয়রান্ হইয়া যায়, কিন্তু জ্ঞান হয় না। কেমন করিয়া তোমার সঙ্গ পাইব জানি না। প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে, প্রতি পদক্ষেপে তোমার সঙ্গ প্রয়োজন, কিন্তু আমার মত লোক বোধ হয় তোমায় পাইবার অনুপযুক্ত, তাই দেখিতেছি আমার চারিদিকে প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড দুর্গ উত্থিত হইতেছে। দুর্গে, ঐ সব ভেদ না করিলে তোমার দেখা পাইব না। হয় দেখা দাও, না হয় জীবনের ইতি দাও।"

হেরম্বচন্দ্রের দৈনন্দিত লিপি পাঠ করিলে সত্যসত্যই মনে হয়, তিনি মায়ের চিরসঙ্গ লাভ করিবার জন্য এত শীঘ্র "জীবনের ইতি দিয়া" দিব্য-দেহে মায়ের সমীপে গমন করিয়াছেন। তাঁহার দৈনন্দিন বিবরণী হইতে আর কত তুলিব, উহার প্রতি পৃষ্ঠা গভীর ব্যাকুলতা-ব্যাঞ্জক, প্রাণস্পর্শী প্রার্থনার কথায় পরিপূর্ণ। তেজস্বী যুবক 'মা" "মা" বলিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাসী ভক্তের ন্যায় মুখোমুখি মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেন, তাঁহার শত শত আবদার, সুখ দুঃখ, সবলতা দুর্ব্বলতা, সকল কথাই মায়ের সহিত চলিত। অধ্যয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে, স্বজনে, নির্জ্জনে সর্ব্বত্র তিনি মায়ের সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, যে কার্য্যে তিনি তাঁহার প্রাণারামের ইচ্ছা অনুভব না করিতেন, সেই কার্য্যেই অসহ্য জ্বালা অনুভব করিতেন।

বিশ্বাসী হেরম্বচন্দ্রের অন্তশ্চক্ষু নিঃসন্দেহ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত দৈনিক লিপি পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, তেজস্বী হেরম্বচন্দ্র আপনার ভিতরে বিশ্বজননীর সত্তা অনুভব করিতেন। এক স্থলে লিখিয়াছেন—'মা, আজ ১৪।১৫ দিন পরে প্রাণে একটু পা দিয়া ছুঁইলি ছুঁইলি বোধ হইল। এক কণা আনন্দ পাইয়া কত দিন পরে যে কি আনন্দ তাহা প্রাণের দেবতা তুমিই জান'।।

স্থানান্তরে তিনি লিখিতেছেন :—

Whom I do not clearly see but of Whoso existence I am sometimes aware,

আবার অন্যত্র বলিতেছেন—"বোধ হইল যেন ভগবান্ দূর হইতে প্রাণের মধ্যে একবার উঁকি মারিলেন"। হেরম্বচন্দ্রের অনুতাপাশ্রু বিধৌত স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে জগজ্জননীর ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাই তিনি মায়ের নামে এত মাতোয়ারা হইয়াছিলেন এবং এত শীঘ্র শীঘ্রই মায়ের চির সঙ্গলালসায় দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।

নাম গানে হেরম্বচন্দ্রের এক অপূর্ব্ব রুচি জন্মিয়াছিল। কীর্ত্তনও নাম জপে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরক্তি ছিল। তিনি বলিতেন যে, ভগবানের নাম লইতে লইতে এরূপ অভ্যাস করা প্রয়োজন যে, মৃত্যু সময়ে স্বতঃই তাঁহার নাম হৃদয় হইতে বাহির হইবে। মৃত্যুকালে ভক্ত হেরম্বচন্দ্র ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি শ্বাসে শ্বাসে ভগবানের নাম লইতে লইতে আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন।

হেরম্বচন্দ্র সঙ্গীত শাস্ত্রবিৎ ওস্তাদ ছিলেন না। তথাপি প্রেমিক যুবকের আন্তরিকতায় তাঁহার সঙ্গীতগুলি প্রাণস্পর্শী হইত। তিনি অনেক সময়ে স্বরচিত সঙ্গীত দ্বারা আপনার প্রাণের ভাব ভগবানকে নিবেদন করিতেন। উক্ত সঙ্গীতগুলি যুবকের হৃদয়ের সরলতা, অনুরাগ ও গভীর ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটী গান উদ্ধৃত হইল :—

"দয়াময়ী মাগো আমার এসে লও" গানের সুর।

কত ভাল গো মা, ভাবিলে আমাতে আমি থাকি না,
পুতিগন্ধময় এ দীন হৃদয়, অশান্তিতে যেন জলন্ত নিরয়,
আমায় এইত ভালবাস, তাতেই কর বাস
তোমায় ভুলি তবু (তুমি) আমায় ভুল না

লুকিয়ে লুকিয়ে থাক মা হৃদয়ে, আমারে সদাই কোলেতে করিয়ে,
মোহ মত্ত হ'য়ে থাকি মা ঘুমায়ে, (তোমার) কোলে বসে তোমায়
দেখিতে পারি না,
(যখন পাপী বলে মোরে সবাই ঘৃণা করে, দেখিলে নয়নে সরে যায় দূরে,)
পাপের কুহকেতে পড়ি, যদি পাপ করি, যত ভাই বন্ধু সবাই যায় ছাড়ি।
কিন্তু তুমি মা সন্তানে, কিন্তু কোন দিনে,
তিলেক তরে ছেড়ে থাকিতে পার না।

—*—

"বনবাসী হব আমি" সুর।

মা আমারে নিয়ে যাগো, তুই হাতে ধ'রে।
আর ত আমি রইতে নারি এই অন্ধকারে॥
প্রাণে মম মোহ কাম, দহিতেছে অবিরাম
কত আর সইব বল, বল মা, আমারে।
তোমার যত স্নেহের সুত, আপনার পানে চাহে নাত
ঘৃণা করে বুঝি তাদের ছুঁইতে আমারে।
মোহের বাঁধন দে মা কেটে, জ্ঞানালোক উঠুক ফুটে
কামানল দে নিবিয়ে, ঢাল প্রেম অন্তরে।

—০—

পুরবী—আড়া।

বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল নিয়ে যা' মা আমায় ঘরে।
রাঙ্গা রবি ডুবে গেল, শ্যাম আঁধার এল ঘিরে॥

সারাদিন খেলে ধূলায়, কত যে লেগেছে গায়,
মুছিয়ে কে দিবে আমায় প্রাণ কাঁদে তাই তোমার তরে।
বেরিয়েছি সেই ভোরে, মজেছিনু খেলার ঘোরে
এতক্ষণ না দেখে তোরে প্রাণ যে কেমন করে!
আর ত সহে না দেরি, চ'লে আয় মা ত্বরা করি,
স্নেহের কোলে নে মা ধ'রে জুড়াই প্রাণ দেখে তোরে।

—:—
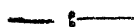
মুলতান—আড়াঠেকা।

মা'র বুক থেকে ছিনাইয়ে কে আমারে নিয়ে এল?
আহা কে নিঠুর হেন এই ধূলা মাঝে ফেলে গেল?
উষাকালে নিয়ে এল, বেলা যে অনেক হ'ল
পিপাসায় বুক শুকাইল মা আমার কোথা র'ল?
কোথা মা'র কোমল বুক, কোথা তার স্নেহের মুখ
কোথা বা সে স্তন্য সুধা এ সব কেবা ভুলাইল?
মা ছাড়া যে রইতে নারি, গেল প্রাণ গেলো পুড়ি
আমার সর্ব্ব অঙ্গ অবশ হ'ল জীবন বুঝি গেল গেল।
সন্ধ্যা বেলা হ'য়ে এলে মা ছাড়া কি রয়গো ছেলে?
আমি ও মা সন্ধ্যা হলে, পাই যেন গো তোমার কোল।

উপরে যে সঙ্গীত কয়েকটী লিখিত হইয়াছে উহা হেরম্বচন্দ্রের কাতরা ও ব্যাকুলতা জ্ঞাপক। অপর কয়েকটী গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল এ গুলি বিশ্বাসী যুবকের তেজস্বিতা ও ভগবৎ প্রেম প্রকাশ করিবে—

———

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—মধ্যমান।

দুঃখ যদি সুখের তরে দিতেছ মা দুঃখ-হরা
দাও তবে মা যত দিবে বয়ে বয়ে হব সারা।
ব'ল না মা সুখের কথা, পাছে তাহে কমে ব্যথা
আমায় দিন যামিনী দুঃখের মাঝে ধরে রাখ পরাৎপরা।
ফুরাইলে দুঃখ রাশি হের্‌ব মা তোর সুখের হাসি
তখন উঠ্‌ব কোলে সুখময়ী হয়ে যাব আপনা হারা।

কীর্ত্তনের সুর।

কবে ও চরণ পরশরতন পরশে হইবে সোণা?"
প্রাণের হরিষে রজনী দিবসে গাইব সঙ্গীত নানা।
(প্রেমে নেচে নেচে কভু বাহু তুলে)
(কবে) সংসার দহনে কুলোক বচনে হেরিব তোমার প্রীতি
(আমার) মোহময় প্রাণে দিনে দিনে দিনে উথলিবে প্রেম গীতি
(সে দিন আমার কবে হবে) (সে দিন হবে নাকি?)
কবে নীল নীরদে বারি ধারা হৃদে মোহন মাধুরী তব
দেখিয়া দেখিয়া রহিব মজিয়া আর কি কথাটী কব?
(চুপ হয়ে যাব)
(কবে) হৃদয় দুয়ারে, খুলি অকাতরে, রাখিব দিবস যামিনী
ভব-মরু মাঝে যত পান্থ আছে জুড়াব তাদেরে আমি।
(প্রেমের বাতাস দিয়ে) (আশার বারি দিয়ে)।

ইমন কল্যাণ।

ভিতরে লুকিয়ে থাক।
যত কিছু করি মা সকলই দেখ॥
যখন আমি নিরজনে থাকি একা শূন্য প্রাণে
সুধা ধারা ঢাল প্রাণে কত যতনে।
মনের বাসনা যত হয় যেন মন্ত্রাহত
যতন ক'রে করে ধ'রে বুকে তুলে রাখ॥
করিতে তোমার ধ্যান সঙ্গীতে পূরে প্রাণ
থাকে না বাহ্যজ্ঞান বাহির থাক বাহিরে।
কি আনন্দ হিল্লোলে নাচাও মন মাতালে
অজ্ঞাত মধুর ভাবে মাতাইয়ে রাখ।
(মাঝে মাঝে মধুর মধুর তানে)॥

রাম প্রসাদী।

তবু কি মা তোমায় ছাড়ি।
যদি ঢেলে দাও মা বজ্র অনল রাখ্‌ব হৃদে যতন করি॥
পাপ-পুণ্য, ধন-দৈন্য তার জন্যে কি শঙ্কা করি;
যদি যেতে হয় মা নরকবাসে যাব মুখে ঐ নামটী করি॥
(ভবের) উত্তাল তরঙ্গ হেরে আমার এই ক্ষুদ্র পরাণ আর কি ডরে?
এবার ঝাঁপ দিব মা দুর্গা বলে এতে বাঁচি কিম্বা মরি॥

প্রেমময়ী আমার মা।
আমি তারে ছাড়া থাকি না॥
মা করেছেন স্নেহ দান নিয়ে গেছেন (আমার) ছোট প্রাণ;
আমি ব'সে ব'সে করি গান পাপ আমায় আর ধরে না।
(যখন) বসে থাকি মায়ের কাছে, সংসার কত প্রেম যাচে
আমি মধুর করে বলি তারে আমার পরাণ দিব না।
বসি যখন মায়ের কোলে চুমো দেন মা কপোলে
সোহাগ করে কত কি বলে বোঝে তাই কেবল প্রাণ।
পিপাসায় প্রাণ হ'লে ব্যাকুল তখনি পাই মায়ের কোল
মায়ের কোলে বসে হেসে হেসে স্তন্যসুধা করি পান॥

হেরম্বচন্দ্র যেরূপ নৈতিক তেজ দ্বারা শত শত পাপ পরাভূত করিতেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি একজন তেজস্বী যুবক ছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সকল লোকের প্রকৃতি গম্ভীর তাঁহাদের চরিত্রে মধুরতা থাকে না, কিন্তু হেরম্বচন্দ্রের চরিত্র গাম্ভীর্য্য ও মধুরতার অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। প্রেম ও কর্ম্মশীলতা, ভাবকতা ও কর্ত্তব্যপরয়াণতা, কারুণ্য ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি যুবকের চরিত্র অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

হেরম্বচন্দ্র চিরদিনই চালক ছিলেন। একটী দলের নেতা হইতে হইলে, যে সকল সদ্গুণে বিভূষিত হওয়া আবশ্যক, তিনি তৎসমস্তের অধিকারী ছিলেন। বরিশালে অবস্থান কালে আমরা দেখিয়াছি যে, এক দল যুবক ও বালক তাঁহার নিতান্ত অনুগত ছিল। ইহারা তাঁহাকে আদর্শ চরিত্র মনে করিয়া তাঁহাকে অনুকরণ করিত। হেরম্বচন্দ্রও তাহাদিগকে সহোদর তুল্য স্নেহ করিতেন। তাহারাও হেমচন্দ্রকে

রোগশয্যায় স্নেহময়ী জননী, বিপৎকালে শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, আনন্দের দিনে প্রিয় সুহৃদ্ এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ কার্য্যাদির ভিতরে অভিভাবক বলিয়া জানিত।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের তদানীন্তন ছাত্রগণ সকলেই এই যুবককে তেজস্বী ও চরিত্রবান্ বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। বরিশালবাসী অধিকাংশ লোকই এই পরোপকারী নিরহঙ্কার যুবককে চিনিতেন। হেরম্বচন্দ্রের মৃত্যুতে বরিশাল সহরে ছাত্রসমাজের ভিতর যেরূপ হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, কোন ছাত্রের মৃত্যুতে এরূপ সহরব্যাপী বিলাপধ্বনি শুনা যায় নাই। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ শতাধিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই স্বর্গীয় সাধু যুবকের মৃত্যু দিনে এক্ষণও প্রতি বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ে শীতার্ত্ত অসহায় নরনারীদিগকে ৬৬ খানি কম্বল বিতরণ করা হইয়া থাকে। বরিশালবাসী কয়জন পদস্থ ব্যক্তির ভাগ্যে এরূপ সম্মান সঞ্চিত আছে জানি না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুচিন্তা ও শেষাঙ্ক।

হেরম্বচন্দ্র আপনার মৃত্যুর কথা মাঝে মাঝে চিন্তা করিতেন, কখন বা প্রিয় সুহৃদ্‌গণের সহিত এ সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিতেন। তাঁহার দৈনন্দিন লিপির এক স্থলে (১৫ই এপ্রিল, ১৯০১) লেখা আছে—"মৃত্যু ভয় অনবরত আমায় যন্ত্রণা দেয়, মনকে কত বুঝাই, মাকে কত বলি কিছুতেই মন বোঝে না।" তিনি মৃত্যুর কথা ভাবিয়া কেন ভীত হইতেন, এ কথার উত্তর তিনি দৈনন্দিন লিপিতে কোথায়ও কিছু লিখেন নাই। একজন বন্ধু বলিয়াছেন যে তিনি জননী ও ভ্রাতৃগণের ভাবী দুর্দ্দশার কথা মনে করিয়া মৃত্যুচিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক, হেরম্বচন্দ্র যে ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সর্ব্বদাই তিনি যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মৃত্যুর কথা উঠিলেই তিনি বলিতেন "ভগবানের নাম লইতে লইতে আমাদের এরূপ অভ্যাস করিবার প্রয়োজন, যেন মৃত্যুসময়ে আমরা তাঁহার নাম করিতে করিতে চলিয়া যাইতে পারি।"

মুমূর্ষু রোগীর কর্ণমূলে ভগবন্নামোচ্চারণ তাঁহার সেবাব্রতের একটী বিশেষত্ব বলিয়া উক্ত হইতে পারে। মৃত ব্যক্তির পারত্রিক কল্যাণ কামনায় তিনি শ্মশানে তাঁহাদের স্বর্গীয় আত্মার জন্য উপাসনা করিতেন।

শারদীয় পূজাবকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯০১) হেরম্বচন্দ্রের সহাধ্যায়ী মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মুমূর্ষু বন্ধুর শিয়রে বসিয়া তিনি তাঁহাকে ভগবানের নাম শুনাইতে-ছিলেন। তখন তিনি আপনার ভাবী মৃত্যুর যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন, বাস্তব দৃশ্যের সহিত তাহা প্রায় সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হয় বলিয়া এস্থলে উহা যথাযথ বর্ণিত হইল—

এই মুহূর্ত্তে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, আমার যদি এরূপ অবস্থা হইত, আমি ঔষধ গলাধঃকরণ অপেক্ষা বরং * * * * সোণা ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণের চরণামৃত পান করিতাম, এবং তাঁহাদের মুখোচ্চারিত ভগবানের মধুর নাম শ্রবণ করিতাম। কারণ ভক্তদের মুখনিঃসৃত মধুর ভগবন্নাম অধিকতর মধুর। আমি আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিব, যদি এমন সময়ে অশ্বিনী বাবু এবং আমার প্রাণাধিক সুহৃদ্‌গণের মুখে ভগবানের নাম শুনিতে পাই। আমি নিতান্ত হতভাগা হইলেও এরূপ সম্মিলিত বন্ধু ও ভক্তগণের মধ্যে এবং তাঁহাদের পবিত্রহৃদয়-নিঃসৃত ভগবন্নামের স্রোতের ভিতরে আনন্দে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারি। আমি যদি আজকাল মৃত্যুমুখে পতিত হই, ভগবান্ করুন যেন এরূপ ভাবে আমার মৃত্যু হয়।

পবিত্রহৃদয় হেরম্বচন্দ্রের এই আন্তরিক প্রার্থনা ভগবান্ পূর্ণ করিয়া-ছিলেন। ভক্ত সোণা ঠাকুর ব্যতীত প্রার্থিত অপর প্রায় সমস্ত বন্ধু ও ভক্তগণ তাঁহার অন্তিম সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

পূজার ছুটিতে হেরম্বচন্দ্র বাড়ী যান নাই। বরিশাল থাকিয়া পরবর্ত্তী বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই সকল অবসর দিনে তিনি দিবাভাগে খুব অধ্যয়ন করিতেন, রাত্রিকালের প্রায় অর্দ্ধাংশ কীর্ত্তনানন্দে কাটিয়া যাইত! ৭ই নবেম্বর হেরম্বচন্দ্র জ্বরগ্রস্ত হন। তৎপূর্ব্বে ৪।৫ রাত্রি তিনি উন্মত্তভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। জ্বরের দ্বিতীয়

দিবস হইতেই স্থানীয় তদানীন্তন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এল, এম, এস, এবং বহুদর্শী শ্রীযুত তারিণীকুমার গুপ্ত এল, এম, এস, মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার চিকিৎসা চলিতে থাকে। সদাশয় চিকিৎসকগণের কেহই এই যুবকের নিকট দর্শনী গ্রহণ করিতেন না। স্বনামখ্যাত অশ্বিনী বাবু সর্ব্বদাই রোগীর খবর লইতেন। হেরম্বচন্দ্র উত্তরোত্তর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পরিতে লাগিলেন। তিনি "এ যাত্রা আর রক্ষা পাইব না" এরূপ প্রকাশ করিলেন। চিকিৎসকগণ কিম্বা অপর কেহ মৃত্যুর পূর্ব্বদিনও পীড়া সাঙ্ঘাতিক বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। ১৪ইং নবেম্বর, ১৯০১ সন বেলা ১২ ঘটিকার সময়ে হেরম্বচন্দ্র আনন্দধামে গমন করেন। তিনি উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী রচনা করিতে চেষ্টা পান—

হরির নাম রসে যার প্রাণ ডুবে রয়
অমাবস্যার নিশাযোগে তার হয় চন্দ্রোদয়।
ও কি শান্তি পাইল (হরি ব'লে রে)
সংসার ছাড়িল।
পড়িলে বিপদের ফাঁদে হরি হরি ব'লে কাঁদে
আনন্দ সাগরের মাঝে হেলে দুলে রয়,
আমার মত যে জন হয় সেও খেলা দেখে
স্থির থাকিতে না রয়।

রোগাতিশয্যে মস্তিষ্কের বিকার অবস্থায় রচিত উদ্ধৃত সঙ্গীতটী অসম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও, মুমূর্ষু যুবক ভগবচ্চরণে ঐকান্তিক-ভাবে আত্মসমর্পণ হেতু কিরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ করিতেন তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই দিন বেলা ৮ ঘটিকার সময় হঠাৎ তাঁহার

অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। সেবকগণ অধীর হইয়া তারিণী বাবু ও অশ্বিনী বাবু প্রভৃতিকে সংবাদ দিলেন, অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর সাঙ্ঘাতিক হইতে লাগিল। বন্ধুগণ, সেবকগণ ও গুরুজনগণ হেরম্বচন্দ্রের মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া অতিমাত্র বিষাদিত হইলেন। ব্রজমোহন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ব্রজেন্দ্র বাবু, ডাক্তার তারিণী বাবু, পণ্ডিত কালীশ-চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ও অপর বহু ভদ্রজন তথায় বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হেরম্বচন্দ্র আপনার মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে অশ্বিনী বাবুকে ভগবানের নাম করিতে বলিলেন। তিনি তাঁহাকে নিজ মুখেই নাম লইতে বলেন; তখন সাধু যুবক শ্বাসে শ্বাসে "দুর্গা দুর্গা" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সে গম্ভীর দৃশ্য অবর্ণনীয়। দেবদেশ-যাত্রী বিশ্বাসী মুমূর্ষুর মুখের সেই ভগবন্নাম কতদূর মধুর ও প্রাণস্পর্শী, ভাষায় কি তাহা বর্ণনা করা সম্ভবপর? সে দৃশ্য দেখিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও কিছু সময়ের জন্য ভক্তি ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়া থাকে।

ইতিমধ্যে হেরম্বচন্দ্র জগদীশ বাবুকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতি অল্প সময় মধ্যে তিনি তথায় আনীত হইলেন। জগদীশ বাবু হেরম্বচন্দ্রকে তাঁহার পরম প্রিয় 'ওঁ তৎসৎ' স্মরণ করাইয়া দিলেন। যুবকের মুখশ্রী তখন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি হৃষ্টচিত্তে "হরি" ওঁ তৎসৎ" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অতঃপর হেরম্বচন্দ্র কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের বিরচিত গানের একটা পদ "তখন তোমার চরণ পায় দরশন, যেন গো অন্তর আঁখি" এবং ভগবদ্গীতার

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

এই শ্লোকটী আবৃত্তি করেন। এই শ্লোকই তাঁহার শেষ পার্থিব ভাষায় মনোভাব-ব্যক্তি।

বেলা ১২।। ঘটিকার সময়ে তিনি ইহলোক ছাড়িয়া দিব্যধামে গমন করেন। যে প্রেমময়ী জননীকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে প্রেমের অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, মনে হয় তিনি ভৌতিক দেহ ছাড়িয়া দিব্যদেহে সেই মাকে দেখিবার জন্য দেবধামে গমন করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি ভগবান্ ব্যতিরেকে অপরের ভাগ্যে এ হেন গৌরবের মৃত্যু ঘটে না। হেরম্বচন্দ্রের শেষ দৃশ্যের ভিতরে বিভীষিকায় লেশমাত্র ছিল না। সংসারাসক্ত বিষয়ী লোক মৃত্যু সময়ে যেমন কাতরতা প্রকাশ করেন, এ দৃশ্যে তেমন কিছু ছিল না। তেজস্বী যুবক রণজয়ী সেনাপতির ন্যায় গৌরবের সহিত প্রফুল্লচিত্তে পাপ পঙ্কিল পৃথিবী ছাড়িয়া পুণ্য ও প্রেমের রাজ্যে গমন করিয়াছেন।

যে জগৎপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় তেজ ধ্যান করিয়া হেরম্বচন্দ্র অতুলানন্দ সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন; যে প্রেমময় দেবতা হইতে তিনি উদ্ভূত, যাঁহার প্রেমপ্রস্রবণের প্রেমাঞ্জলি পান করিয়া তিনি কিছুদিন এ মরুদেশে প্রেমের খেলা খেলিয়া গিয়াছেন, আজ তিনি তাঁহারই সহিত তন্ময় হইয়া জগন্ময় বিহার করিতেছেন।

গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

সুতরাং আমাদের হেরম্বচন্দ্র প্রেমময়ী জননীর জন্য পাগল হইয়া তাঁর নাম গাইতে গাইতে সংসার ছাড়িয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া গিয়াছেন, ইহা অসম্ভব নহে।

যাও ভাই, এ পাপ পৃথিবী ছাড়িয়া নিত্যধামে চলিয়া যাও। আমরা তোমার স্বর্গীয় আত্মার জন্য আর কি প্রার্থনা করিব। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার ধর্ম্মপ্রাণতা তেজস্বিতা ও পূতচরিত্র স্মরণ করিয়া দিন দিন উন্নত হইতে পারি।

তুমি তোমার উন্মাদিনী জননী, অনাথিনী বাল বিধবা, শোকার্ত্ত ভ্রাতা ও বন্ধুদের হৃদয়ে শান্তি প্রদান কর, তোমার স্বর্গীয় আত্মার নিকট এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।